রং-বেরং

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৫
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮
দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৬৭
এপ্রিল, ১৯৬০
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২
ছবি এঁকেছেন
শৈল চক্রবর্তী
ছেপেছেন
সুশীলকুমার ঘোষ
মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬

কানকাটা রাজার দেশ

এক ছিল রাজা আর তার ছিল এক মস্ত বড় দেশ তার নাম হল কানকাটার দেশ। সেই দেশের সকলেরই কান কাটা। হাতি, ঘোড়া, ছাগল, গরু, মেয়ে, পুরুষ, গরিব, বড়মানুষ, সকলেরই কান কাটা। বড়লোকদের এক কান, মেয়েদের এক কানের আধখানা, আর যত জীবজন্তু গরিব দুঃখীদের দুটি কানই কাটা থাকতো। সে দেশে এমন কেউ ছিল না যার মাথায় দুটি আস্ত কান, কেবল সেই কানকাটা দেশের রাজার মাথায় একজোড়া আস্ত কান ছিল। আর সকলেই কেউ লম্বা চুল দিয়ে, কেউ চাঁপ দাড়ি দিয়ে, কেউ বা বিশ গজ মলমলের পাগড়ি দিয়ে কাটা কান ঢেকে রাখতো, কিন্তু সেই রাজা মাথা একেবারে স্যাড়া করে সেই স্যাড়া মাথায় জরির তাজ চাপিয়ে গজমোতির বীরবৌলিতে দুখানা কান সাজিয়ে সোনার রাজ-সিংহাসনে বসে থাকতেন।

একদিন সেই রাজা এক-কান মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কানকাটা ঘোড়ায় চেপে শিকারে বার হলেন। শিকার আর কিছুই নয়, কেবল জন্তু-জানোয়ারের কান কাটা। রাজ্যের বাইরে এক বন ছিল, সেই বনে কানকাটা দেশের রাজা আর এক-কান মন্ত্রী কান শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। এমনি শিকার করতে করতে বেলা যখন অনেক হল, সূর্যদেব মাথার উপর উঠলেন, তখন রাজা আর মন্ত্রী একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় ঘোড়া বেঁধে, শুকনো কাঠে আগুন করে যত জীব-জন্তুর শিকার-করা কান রাঁধতে লাগলেন। মন্ত্রী রাঁধতে লাগলেন আর রাজা খেতে লাগলেন, মন্ত্রীকেও দু-একটা দিতে থাকলেন। এমনি করে দুজনে খাওয়া শেষ করে সেই গাছের তলায় শুয়ে আরাম

করছেন, রাজার চোখ বুজে এসেছে, মন্ত্রীর বেশ নাক ডাকছে এমন সময় একটা বীর হনুমান সেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাজাকে বললে—'রাজা, তুই বড় দুষ্টু, সকলের কান কেটে বেড়াস, আজ সকালে আমার কান কেটেছিস ; তার শাস্তি ভোগ কর্।' এই বলে রাজার দুই গালে দুটো চড় মেরে একটা কান ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। রাজা যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হল, তখন রাজা চারিদিকে চেয়ে দেখলেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, হনুমানটা কোথাও নেই, মন্ত্রীবর পড়ে-পড়ে নাক ডাকাচ্চেন। রাজার এমনি রাগ হল যে তখনি মন্ত্রীর বাকি কানটা এক টানে ছিঁড়ে দেন ; কিন্তু অমনি নিজের কানের ... নে পড়লো, রাজা দেখলেন ছেঁড়া কানটি ধূলায় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেটিকে তুলে নিয়ে সযত্নে পাতায় মুড়ে পকেটে রেখে, তাজ টুপির সোনার জরির ঝালর-কাটা কানের উপর হেলিয়ে দিলেন যাতে কেউ কাটা কান দেখতে না পায়, তারপর মন্ত্রীর পেটে দুই গুঁতো মেরে বললেন—'ঘোড়া আনো।' এক গুঁতোয় মন্ত্রীর নাক ডাকা হঠাৎ বন্ধ হল. আর-এক গুঁতোয় মন্ত্রী লাফিয়ে উঠে রাজার সামনে ঘোড়া হাজির করলেন। রাজা কোনো কথা না বলে একটি লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদম ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়িতে হাজির। সেখানে তাড়াতাড়ি সহিসের হাতে ঘোড়া দিয়েই একেবারে শয়ন-ঘরে খিল দিয়ে পালঙ্কে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সকাল হয়ে গেল, রাজবাড়ির সকলের ঘুম ভাঙল, রাজা তখনও ঘুমিয়ে আছেন। রাজার নিয়ম ছিল রাজা ঘুমিয়ে থাকতেন আর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দিতো, সেই নিয়ম-মতো সকাল বেলা নাপিত এসে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলে। এক গাল কামিয়ে যেই আর-এক গাল কামাতে যাবে এমন সময় রাজা 'দুর্গা দুর্গা' বলে জেগে উঠলেন। নজর পড়ল নাপিতের দিকে, দেখলেন নাপিত ক্ষুর হাতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কানে হাত দিয়ে দেখলেন, কান নেই।

াজা আপসোসে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে নাপিতের হাতে ধরে বললেন—'নাপিত ভায়া এ কথা প্রকাশ কোরো না। তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেবো।' নাপিত বললে—'কার মাথায় দুটো কান যে এ কথা প্রকাশ করবে!' শুনে রাজা খুশি হলেন। নাপিতের কাছে আব-আধখানা দাড়ি কামিয়ে তাকে দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন। নাপিত মোহর নিয়ে বিদায় হল বটে কিন্তু তার মন সেই কাটা কানের দিকে পড়ে রইলো। কাজে কর্মে, ঘুমিয়ে জেগে, কি লোকের দাড়ি কামাবার সময়, কি সকাল কি সন্ধ্যা মনে হতে লাগলো—রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা ; কিন্তু কারুর কাছে এ কথা মুখ ফুটে বলতে পাবে না, মাথা কাটা যাবে। নাপিত জাত সহজেই একটু বেশি কথা কয়, কিন্তু পাছে অন্য কথার সঙ্গে কানের কথা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মুখ একেবারে বন্ধ হল। কথা কইতে না পেয়ে পেট ফুলে তার প্রাণ যায় আর কি!

এমন সময় একদিন রাজা নাপিতের কাছে দাড়ি কামিয়ে সোনার কৌটো খুলে কাটা কানটি নেড়ে-চেড়ে দেখছেন, আর অমনি কোত্থেকে একটা কাক ফস্ করে এসে ছোঁ মেরে রাজার হাত থেকে কানটি নিয়ে উড়ে পালালো। রাজা বললেন—'হাঁ হাঁ হাঁ ধরো ধরো! কাক কান নিয়ে গেল!' তারপর রাজা মাথা ঘুরে সেইখানে বসে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, প্রজাদের কাছে কী করে মুখ দেখাবো।

এদিকে নাপিত ক্ষুর ভাঁড় ফেলে দৌড়। পড়ে তো মরে এমন দৌড়। শহরের লোক বলতে লাগলো—'নাপিত ভায়া নাপিত ভায়া হল কী? পাগলের মত ছুটছ কেন?'

নাপিত না রাম না গঙ্গা কাকের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে একেবারে অজগর বনে গিয়ে হাজির। কাকটা একটা অশ্বত্থ গাছে বসে আবার উড়ে চললো, কিন্তু নাপিত আর এক পা চলতে পারলে না, সেই গাছের তলায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো—'এখন কী করি? রাজার কান কাটা ছিল, তখন অনেক কষ্টে সে কথা

চেপে রেখেছিলুম; এখন সেই কান কাকে নিলে এ কথাও যদি আবার চাপতে হয় তাহলে আমার দফা একদম রফা! ফোলা পেট এবারে ফেঁসে যাবে এখন করি কী? নাপিত এই কথা ভাবচে এমন সময় গাছ বললে—'নাপিত ভায়া ভাবছ কী?'

নাপিত বললে—'রাজার কথা।'

গাছ বললে—'সে কেমন?'

তখন নাপিত চারিদিকে চেয়ে চুপি চুপি বললে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

এই কথা বলতেই নাপিতের ফোলা পেট একেবারে কমে আগেকার মত হয়ে গেল, বেচারা বড়ই আরাম পেলে, এক আরামের নিশ্বাস ফেলে মনের ফূর্তিতে রাজবাড়িতে ফিরে চললো।

নাপিত চলে গেলে বিদেশী এক ঢুলি সেই গাছের তলায় এল। এসে দেখলে গাছটা যেন আস্তে আস্তে দুলছে, তার সমস্ত পাতা থরথর করে কাঁপছে, সমস্ত ডাল মড়মড় করছে—আর মাঝে মাঝে বলছে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

ঢুলি ভাবলে এ তো বড় মজার গাছ! এরই কাঠ দিয়ে একটা ঢোল তৈরি করি। এই বলে একখানা কুড়ুল নিয়ে সেই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।

গাছ বললে—'ঢুলি, ঢুলি, আমায় কাটিসনে।'

—আর কাটিসনে! এক, দুই, তিন কোপে একটা ডাল কেটে নিয়ে, ঢোল তৈরি করে—'রাজার কান কাটা, রাজার কান কাটা' বাজাতে বাজাতে ঢুলি কান-কাটা শহরের দিকে চলে গেল।

এদিকে কানকাটা শহরের রাজা কান হারিয়ে মলিন মুখে বসে আছেন আর নাপিতকে বলছেন—'নাপিত ভায়া এ কথা যেন প্রকাশ

না হয়।' নাপিত বলছে—'মহারাজ কার মাথায় দুটো কান যে এ কথা প্রকাশ করবে।' এমন সময় রাস্তায় ঢোল বেজে উঠলো—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে নাপিতের চুলের মুঠি এক হাতে আর অন্য হাতে খাপ-খোলা তরোয়াল ধরে বললেন—'তবে রে পাজি! তুই নাকি এ কথা প্রকাশ করিস নি? শোন্ দেখি ঢোলে কী বাজছে!' নাপিত শুনলে ঢোলে বাজছে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

নাপিত কাঁপতে কাঁপতে বললে—'দোহাই মহারাজ, এ কথা আমি কাউকে বলি নি, কেবল বনের ভিতর গাছকে বলেছি। তা নইলে হুজুর পেটটা ফেটে মরে যেতুম। আর আমি মরে গেলে আপনার দাড়ি কে কামিয়ে দিত বলুন!'

রাজা বললেন—'চল্ ব্যাটা গাছের কাছে।' বলে নাপিতকে

নিয়ে রাজা মুড়ি-সুড়ি দিয়ে গাছের কাছে গেলেন। নাপিত বললে—'গাছ, আমি তোমায় কী বলেছি? সত্য কথা বলবে।'

গাছ বললে—

'রাজার কান কাটা।
তাই নিলে কাক ব্যাটা॥'

রাজা বললেন—'আর কারো কাছে নাপিত বলেছে কি?'

গাছ বললে—'না।'

রাজা বললেন—'তবে ঢুলি জানলে কেমন করে?'

গাছ বললে—'আমার ডাল কেটে ঢুলি ঢোল করেছে তাই ঢোল বাজছে—রাজার কান কাটা। আমি তাকে অনেকবার ডাল কাটতে বারণ করেছিলাম কিন্তু সে শোনেনি।'

রাজা বললেন—'গাছ, এ দোষ তোমার; আমি তোমায় কেটে উনুনে পোড়াবো।'

গাছ বললে—'মহারাজ, এমন কাজ কোরো না। সেই ঢুলি আমার ডাল কেটেছে, আমি তাকে শাস্তি দেবো। তুমি কাল সকালে তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।'

রাজা বললেন—'আমার কাটা কানের কথা প্রকাশ হল তার উপায়? প্রজারা যে আমার রাজত্ব কেড়ে নেবে!'

গাছ বললে—'সে ভয় নেই, আমি কাল তোমার কাটা কান জোড়া দোবো।'

শুনে রাজা খুশি হয়ে রাজ্যে ফিরলেন।

রাজা ফিরে আসতেই রাজার রানী, রাজার মন্ত্রী, রাজার যত প্রজা রাজাকে ঘিরে বললে—'রাজামশাই তোমার কান দেখি!' রাজা দেখালেন—এক কান কাটা। তখন কেউ বললে—'ছি ছি', কেউ বললে—'হায় হায়', কেউ বললে—'এমন রাজার প্রজা হবো না।' তখন রাজা বললেন—'বাছারা, কাল আমার কাটা কান জোড়া যাবে, তোমরা এখন সেই ঢুলিকে বন্দী কর। কাল সকালে তাকে নিয়ে

বনে যে অশ্বত্থ গাছ আছে তারই তলায় যেও।' রাজার কথা শুনে প্রজারা সেই ঢুলিকে বন্দী করবার জন্যে ছুটলো।

তার পরদিন সকালে রাজা মন্ত্রী, নাপিত, রাজ্যের যত প্রজা আর সেই ঢুলিকে নিয়ে ধুমধাম করে সেই অশ্বত্থতলায় হাজির হলেন। রাজা বললেন—'অশ্বত্থঠাকুর, ঢুলির বিচার করো।'

অশ্বত্থ ঠাকুর নাপিতকে বললেন—'নাপিত, ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দাও।' নাপিত ঢুলির একটি কান কেটে রাজার কানে জুড়ে দিলে। চারিদিকে ঢাক ঢোল বেজে উঠলো, রাজার কান জোড়া লেগে গেলো। এমন সময় যে হনুমান রাজার কান ছিঁড়েছিল সে এসে বললে—'অশ্বত্থ ঠাকুর, বিচার করো—রাজা মশায় আমার কান কেটেছে, আমার কান চাই।'

অশ্বত্থ বললেন—'রাজা, ঢুলির অন্য কান কেটে হনুকে দাও। এক কান কাটা থাকলে বেচারির বড় অসুবিধা হত—দেশের বাইরে দিয়ে যেতে হত। এইবার ঢুলির দু-কান কাটা হল—সে এখন দেশের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে।'

রাজা এক কোপে ঢুলির আর-এক কান কেটে হনুর কানে জুড়ে দিলেন। আবার ঢাক ঢোল বেজে উঠলো। তখন অশ্বত্থ-ঠাকুর বললেন—'ঢুলি এইবার ঢোল বাজা।' ঢুলি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে ঢোল বাজাতে লাগলো—ঢোল বাজছে—

'ঢুলির কান কাটা।
ঢুলির কান কাটা॥'

রাজা ফুল-চন্দনে অশ্বত্থঠাকুরের পুজো দিয়ে ঘরে ফিরলেন। রানী রাজার কান দেখে বললেন—'একটি কান কিন্তু কালো হল।'

রাজা বললেন—'তা হোক, কাটা কানের চেয়ে কালো কান ভালো। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবীর বাহন

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরীর মন্দিরটা তো হাতে গড়েন নি, তাই তাঁর নাম রয়ে গেল ইতিহাসে আর কালো পাথরের শিলে খুব গভীর করে কাটা। কিন্তু যারা মন্দিরটা এমনকি মন্দিরের দেবতাকেও গড়লে তাদের ইতিহাসে তো নাম রইলই না, মন্দিরের একখানা পাথরের গায়েও তাদের নাম লেখা নেই।

রাজা বিমলা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বসলেন—ব্রাহ্মণদের আর-একটা জমিদারি বাড়লো—তারা রাজাকে আশীর্বাদ করে ঘরে গেল, কিন্তু দেবী তো খুশি হলেন না। গভীর রাত্রে রাজাকে স্বপন হল—জগন্নাথের সামনে তাঁর গড়ুর হাতজোড় করে থাকবে, আর আমার শার্দূল কি কেউ নয় যে তুই তাকে একেবারেই মন্দিরে জায়গা দিলিনে! রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল ঘাম আর কম্প দিয়ে। তখনই শিল্পীর ডাক পড়লো, সভাপণ্ডিত এসে তাকে শার্দূলের ধ্যানটা শুনিয়ে দিলেন—সিংহের মতো মাজা, বাঘের মতো মুখ, কুকুরের মতো থাবা, গরুর মতো ল্যাজ। শিল্পী মাথা চুলকে বাড়ি গেল। এই শিল্পীর নাম লোকে এখনো বলে—শিবাই সাঁতরা। শিবাই একটার পর একটা সিংহ গড়ে রাজাকে দেখাচ্ছে—কোনোটা হচ্ছে ঠিক সিংহ, কোনোটা বাঘ, বিড়াল, কুকুর—কিন্তু একটাও রাজার মনোমত হচ্ছে না, দেবীও ক্রমাগত শিবাইকে স্বপন দিচ্ছেন—'হল না, হল না' কিন্তু সিংহবাহিনী রূপে একটিবারও দেখা দিচ্ছেন না—পাছে শিল্পী তাঁর শার্দূলকে চট্ করে ধরেই পাথরে কেটে ফেলে! ওদিকে দুঃস্বপ্নে আর রাজার তাড়ায় শিবাই দিন-দিন রোগা হচ্ছে এবং তার যেটুকু যা বিদ্যেবুদ্ধি এক শার্দূলের ভাবনায় শুকিয়ে উঠছে; আঠারো-

নালার ধারেই শিবাইএর ঘর। বর্ষার পরে তখন ভরপুর জল আয়নার মত পরিষ্কার তক্‌তক্‌ করছে; সাঁতরার বৌ গেছে জল নিতে, ঠিক সেই সময় আকাশপথে চলেছেন দেবী সিংহবাহিনী, জলে পড়লো তাঁর ছায়া। নিমেষের মতো যেন নীল আকাশ দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল কিংবা যেন জলের তলা দিয়ে একটি সোনার পদ্ম ভেসে গেল। সাঁতরার বৌ দেখেও দেখলে না; তেলে হলুদে নালার জলে খানিক সোনালি রং গুলে দিয়ে হাত পা ধুয়ে বাড়ি এসে রাঁধতে বসল।

শিবাই আর সেদিন বাড়ি আসে না। বিমলার মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়েছে। কিন্তু ক্ষিদে তার জন্যে বসে রইলো না। সাঁতরার বৌ অনেকক্ষণ বসে বসে উনুনের কয়লা নিয়ে হেঁসেল ঘরের দেওয়ালে খানিক নানা আঁচড় পোছড় দিয়ে একটা অদ্ভুত জানোয়ার আঁকলে। তারপর ভাত বেড়ে নিজে খেতে বসবে এমন সময় শিবাই এসে সেই পাতেই বসে গেল, কোন রকম দ্বিধা না করে। কিন্তু হাতের গ্রাস তাকে আর মুখে তুলতে হল না, সামনের দেওয়ালে কয়লার লেখা প্রকাণ্ড শার্দুল-মূর্তিটা চোখে পড়তেই শিবাই 'হয়েছে হয়েছে'—বলে দুই হাত তুলে নাচ আরম্ভ করলে।

বৌ তার অবাক হয়ে শুধোলে, 'ক্ষেপলে নাকি?'

শিবাই তার দিকে কট্‌মট করে চেয়ে বললে, 'বাজে বকিসনে, চট করে হাতুড়ি আর বাটালি আর ছেনি আর খোন্তা নিয়ে আয়, এখনি কাজে লাগবো,—আর ছ্যাখ্‌, বেশ শক্ত দেখে একখানা পাথরও আনবি, বুঝলি?'

'বুঝেছি'—বলেই সাঁতরা-বৌ সাঁ করে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকলটি টেনে পাড়ায় খবর দিতে ছুটলো,—শিবাই ক্ষেপেছে!

বদ্যি ডাকতে, পাড়ার লোক জাগাতে প্রায় ভোর হল। সকালে সকলে দরজা খুলে দেখলে, শিবাই থালার সমস্ত ভাত খেয়ে, ঘর

নিকোবার মাটি দিয়ে মস্ত এক শার্দূলের নমুনা গড়ে দেওয়ালের কয়লার আঁচড়টা জল দিয়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে—তার ভয়, পাছে কেউ বলে সে তার স্ত্রীর দেখে নকল করেছে।

সেই থেকে বিমলা দেবী রাজার উপর তুষ্ট হলেন; আর রাজা খুশি হলেন শিল্পীর উপর। কিন্তু শিবাই তার বৌটার উপর খুশি হল কি না জানা যায় না, ইতিহাসেও তার প্রমাণ নেই।

সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্য

ছন্দবাদ সওদাগর বড় হুসিয়ার। বোগদাদ শহরে ঘর জানিবা তাহার॥
বাসরা বন্দরে হৈল জাহাজে সওয়ার। জাহাজ ক্রমেতে চলে কালাপানি পার॥
ভাসিয়া জাহাজ যায় দরিয়া উপরে। ছামনে জাজীরা এক পড়িল নজরে॥
ছন্দবাদ আর কত জাহাজি মিলিয়া। তামাসা দেখিতে যায় সবে উতরিয়া॥

॥ তুড়ি ॥

এহারা সকলে যারে জাজীরা বুঝিল। হকিমতে মাছ সেটা দরিয়ায় ছিল॥
ভাসিতে আছিল মাছ সোঁতের উপরে। এহারা জানিল দেলে জাজীরা তাহারে॥
মাছের পিঠেতে যদি পৌছিল সকলে। খানা পাকাইতে আগ সেইখানে জ্বালে॥
আতসের তাপ যদি লাগে মাছ পরে। সেতাবি ডুবিয়া গেল দরিয়া ভিতরে॥
যত লোগ ছিল সেই মাছের পিঠেতে। বহুত মশকিলে তারা পৌছিল ডাঙাতে॥

॥ জুড়ি ॥

ডাঙার উপরে যদি পৌছিল সবাই। তদারক করি আমি দেখিনু এয়ছাই॥
ছন্দবাদ নামে ছিল যেই ছওদাগর। না পৌছিল সেইজন ডাঙার উপর॥
দরিয়ার নিচে সেই মরিল ডুবিয়া। এই তো আওহাল তার শুন মন দিয়া॥

সিন্ধবাদ ও কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ

॥ সিন্ধবাদের কথা ॥

মেরা নাম ছন্দবাদ শুনহ কাপ্তান। আমি সেইজন বটি দেখ মেহেরবান॥
আপনি জানিলে যারে মরিল দরিয়ায়। ভালামতে আছি এই দেখহ আমায়॥

॥ সিন্ধবাদের গজল গীত ॥

খার হাজরাত কররে তক দেলসে খাটকতা যায়েগা
মোরগে বেছমেল কি তারেহ লাসা তড়প্তা যায়গা
মন্ন্ গিয়া হোঁ মেয় দুনিয়াকি হাব্বরাত দিদার মে
কররে তর্ক মেরাজ কী রাহ তাকতা যায়েগা

পূর্বের দিকে বনের মধ্যে একটা আর্তনাদ শুনা যায়, কে যেন কোন বিপদে পৈরাছে বোধহয়। কাঠুরিয়াগণ তালাস কৈরা দেখ ব্যাপারখানা কী ঘটিল।

॥ গীত ॥

কাঠুরিয়া। দেখহে খালাসিগণ কইরা খুব নিরীক্ষণ
বিপদে পইরাছে জানি হবে কোন মোহাজন !

খালাসি। কিবা কোন ছওদাগর যেতেছিল ছপর
তুফানে পইরা ডিঙ্গা হৈল তর এইক্ষণ।
কিবা কোন লাখপতি কিম্বা কোন শ্রীমতী
কিবা কর্ণধার ব্যক্তি কিবা চাকরান সেইজন।

সিন্ধ। জাহাজি কি একজন টেণ্ডেস খালাসি কোন
কিম্বা কোন কাপ্তান হবে কি মানুষ ছোখান্ অ।

॥ পদ্য ॥

নজর করিয়া সবে দেখ তাকাইয়া। আছে কোন জন বনে একলা ঘাবড়াইয়া ॥
আদমের হাঁক যেন শুনিনু এয়ছাই। দেখ দেখ খালাসিরা দেখহ সবাই ॥

॥ খালাসি কাঠুরিয়ার পদ্য ॥

গীত

১। ওরে ওরে দেখরে কাঠুরিয়া ভাই
মাটিতে পড়িল চাঁদ দেখিবারে পাই ॥
২। কি বলহে চান্দ নয়, তুমি কিবা বল।
৩। মোর মনে লয় যেন সুরয উঠিল ॥
৪। আরে আরে আরে ভাই তুমি চেন নাই,
আমি যেন কাঞ্চা সোনা দেখিবারে পাই ॥
১। সোনা নয় সোনা নয় মানিকের মুরতি।
২। কভু বনে পয়দা হয় মানিক আর মোতি ॥
৩। শুন ভাই নির্বস হয় বন মানুষ।
৪। দুর দুর নাই তেরা কোন হুস গুস্ ॥

জবুথবু বাবুর প্রবেশ

॥ সিন্ধবাদের গীত ॥

দেখ ভাই আজব জন্তু দুনিয়াতে এসেছে,
তার পশুর মত সকল দেখি কিন্তু লেজটি নাহি আছে।
সে সকাল বেলা খেলা করে চারি পায়ে চলে ফেরে,
দুপুর বেলা দুই পদে হাঁটিতেছে,
সন্ধ্যাবেলা তিনটি পদে চলে খেলা ভাঙিতেছে।
দিবা নিশি ঘরে ঘরে কত জন্তু যাচ্ছে মরে,
এ জন্তু দেখেও তা না দেখিতেছে,
যে মোলো সে মোলো আমি মরিব না ভাবিতেছে।

॥ বাবুর জবাব গীত ॥

বিধি যারে ভালোবাসে তার কাছে কোন জনে
কোন উপলক্ষ দিয়ে সুখে রাখে ধনে মানে।
যত জীব জন্তুগণে ঘুরে ফিরে বনে বনে,
রক্ষা করে নিরঞ্জনে সঙ্কটে ও পতনে।

॥ কাঠুরিয়া ॥

এতদিন কাঠ কাটি এই তো বনেতে। কখন এমন ধারা না দেখি চক্ষেতে॥
বুঝিনু মানব এই কখন না হবে। পালাই চল তা নইলে মশকিল বাধাবে॥

সিন্ধ। মুসকিল আসান, মুসকিল আসান।

বাবু। দোহাই ছাহেব আমি মুসকিল আসান নয়, নিজেই বিয়ে করতে এসে মুসকিলে পড়ে গেছি। ও কাঠুরিয়াগণ আমায় ছেড়ে যেও না, ও ছাহেব আমি তোমার শরণ নিলাম, আর ছাড়ি দেবো না।

॥ বাবুতে সিন্ধবাদে ঝটাপটি ॥

সিন্ধ। দুষ্ট বুড়া কান্দে চাপতি চাও পুনর্বার, মনে নাই পেরেসান কৈরাছিলে পঞ্চম ছফরে। ঘোড়া চাপিয়া বেড়াইলে আমার স্কন্ধে চড়ে! খালাসিগণ ইহাকে বন্ধন কর শক্ত কৈরা। না

বুঝে দুষ্টেরে লইয়া কান্দে পৈরাছিলাম বিষম ফান্দে, এবারে রাহু ধরেছে চান্দে, এখন বিপদে পৈরে কান্দে !

॥ বাবুর গীত ॥

আমার যন্ত্রণা প্রাণে নাহি সয়,
বিপদে পড়েছি এবে রক্ষা কর দয়াময়।
বিপদ সাগরে ডুবিল তরী, উদ্ধার কর হয়ে কাণ্ডারী।
স্বদেশে বিদেশে তুমি উপকারী, তোমা বিনে আর নাহিক উপায়।

॥ সিন্ধবাদের কথা ॥

শুন সবে একভাবে যতেক এয়ার। পঞ্চমের ছফরের যে হাল আমার ॥
জ্যায়ছা মছিবত হৈল আমার উপরে। বর্ণন করিয়া তাহা কয়েছি সবারে ॥
বুড়ার খাতিরে আমি ঠাহরি কম জোর। ছওয়ার করিয়াছিনু গর্দান উপর ॥
যখন এশারা করি নামিতে এহায়। দুই পায়ে নেপটিয়া ধরিল গলায় ॥
এয়ছা গলা দেবে ধরে পাও লাগাইয়া। আমি বলি দম বুঝি গেল নেকালিয়া ॥
চাম বরাবর পাঁও আছিল এহার। তছমার মাফিক ডালে গলেতে আমার ॥
জোর করি বুড়া পাঁও লাগায়ে গর্দানে। বেহোঁস করিয়া মোরে গেরায় জমিনে ॥
হয়রান হইয়াছিনু কাবুতে পড়িয়া। ঘোড়ার মাফিক ফিরি ছওয়ার লইয়া ॥
এইরূপ বহুদিন গর্দানে আমার। ছওয়ার হইয়া রহে বুড়া দুরাচার ॥
কোদরত কামাল বাঁচাইল কোন মতে। নহে তো মরিয়াছিনু এ বুড়ার হাতে ॥

বাবু। সে কোথাকার একটা গাল-গল্পের চিম্‌সে বুড়োর সঙ্গে আমার তুলনা দিচ্ছ ছাহেব! সে ছিল রোগা আমি দেখ মোটা। বুড়োই নই, চুল কালো, দাঁত পড়েনি একটি, কমে নাও বয়েস।

খালাসি। খেজাব লাগিয়েছে, দাঁত বাঁধিয়েছে কর্তা।

সিন্ধ। একা কেন বনমধ্যে কহ দেখি শুনি। এখানে আইলে কেন নাহি জনপ্রাণী॥
বাবু। যেতেছিলাম হস্তিরাজার কন্যাদানে। বনবাস হল সেই কারণে॥

ও হিন্দবাদ তোমার নাম কী, আমায় রক্ষা কর।

সিন্ধ। আমার নাম হিন্দবাদ নয়—ছন্দবাজ জাহাজি, বোগদাদ হল ডেরা আমার। আমার জাহাজগুলা সাত সমুদ্দুর তেরো

রং-বেরং

নদীর লোনা আর মিঠা জলে চলাচল কৈরা কিঞ্চিৎ জখম হয়েছে, সেই কারণে কিছু মন-পবন কাষ্ঠের পিয়োজনে এ দেশে আগমন। হঠাৎ বনের মধ্যি মশয়ের সাতে সাক্ষাৎ।

॥ পদ্য ॥

মালামৎ না করিব তোমার খাতেরে। রহম হইল মুঝে দেখিয়া তোমারে॥
বোঝা মেরা ধরা আছে জাহাজ উপরে। চলহ খালাসিগণ লইয়া এহারে॥
তোমার বোঝায় কেহ না ডালিবে হাত। সেতাবি করিয়া তুমি চল মেরা সাত॥

বাবু। খেতে কিছু দাও না ভাই, নড়িবার শক্তি নাই,
তিনদিন হইল আজ ঘুরিয়া বেড়াই,
ক্ষুধা হইলে বনফল তুলিয়া যে খাই॥

সিন্ধ। খাদেমের সাতে দেখ জাহাজে উঠিয়া,
রঙ্গ রঙ্গ খানা কত রেখেছে চুনিয়া॥
নজর করিয়া তুমি দেখিবে সেথায়,
দস্তখান ধরা আছে চারি কেনারায়॥
ভাতে ভাতে খানা সে আপনি উঠাইয়া,
আহুদা করিয়া তোমায় দেব খিলাইয়া॥
খানা বাদে ছের উঠাইয়া আপনার,
মজলিছের লোকে কই তব সমাচার॥

বাবু। কালাপানি পার হলেম, খানা খেলেম, জাতও দিলেম, তারপর?

সিন্ধ। সেখানে পৌছি জাহাজ কেরায়া করিয়া,
ছওয়ার হইবে চল খোদায় ভাবিয়া॥
রওয়ানা করিয়া জাহাজ তুলিয়া লঙ্গর,
পারেছের দরিয়া মোরা যাব তারপর॥
ডাহিনে আরব রহে পারছ বামেতে,
হিন্দুস্থানের সিধা রাহা ফিরিব ডানেতে॥

বাবু। এ যে মাথা ঘুরিয়ে নাক দেখাতে চলা!

সিন্ধ। তারপর—
জাহাজ বাহিয়া যাব দরিয়ার উপরে,
এয়ছা যে দরিয়া আর না দেখি নজরে॥

সত্তর মাইল সেই দরিয়ার থাই,
আড়াই হাজার মাইল তাহার চৌড়াই ॥
এক দিকে নোনাপানি বহে যে দরিয়ার,
তাহার ছবাবে আমি হইনু বিমার ॥
পানির ছবরে দুঃখু পাই কিছু দিন,
তারপরে ভাল কৈল এলাহি আল্‌মিন ॥

—মশয়ের নাম জানতে পারি?

বাবু। মুই রাজা বাবুরাম, বৈঠকখানায় পাই মান।
সভাতে বসলেই হতমান ॥

খালাসি। মশয়ের রাজত্বি?

বাবু। গোবিন্দপুর সুতানুটির মধ্যস্থান খাটিয়াটি,
বসে থাকি হাতে জাঁতি,
সুন্দরবনের সুপারি কাটি,
থেকে থেকে মারি তবলায় চাঁটি,
অধিক করিনে হাঁটাহাঁটি!

সিন্ধ। কি কইলেন সুন্দরবন,
আমাগর কাষ্ঠের নিমিত্তে সেহানে যাওয়াই পিয়োজন।

কাঠুরিয়া। রাজামশায় আমাগর সাতে আইসেন,
সুপারি গাছে চড়ায়ে দিব, যত চান সুপারি কাটেন!

বাবু। শুনেছি সে বাঘের জঙ্গল,
গেলেই ঘটে অমঙ্গল!

সিন্ধ। কী কইলেন, যাইবেন না? খালাসিগণ, বাবুকে বন্ধন কৈরা টানি লৈয়া চল, বাদশাহি মাল জাহাজে উঠাইয়া লও, এই মাল হারুন বাদশাহের নিকট পৌঁছাও যত্নে। বহুত এনাম বখশিশ খেতাব খিল্লত পাইবা। মাল কোনরূপ নোকছান না হয়, দানাপানি নিয়মিত খিলাইয়া পিনাইয়া তাজা অবস্থায় দরবারে হাজির করিবা, এ প্রকার মাল জলদি পাওয়া তুষ্কর। সেবার

বড় পেরেস্সান কৈরা ছিলে মোরে, ঘোড়া নাচাইয়া ফিরায়েছিলে স্কন্ধে চড়ে।

বাবু। আঃ ছার ছার ছার! জাতিকুল যায় যাক, পরানডা যায় যে হায়।

॥ পতন ও মূর্ছা ॥

॥ খালাসিদের কথা ॥

১। মালের ছিন্দুক যে কাত হল কর্তা।

২। জমি লিয়েছে উঠতি চায় না।

৩। মারো টান হেঁইয়ো জোয়ান, নাখোদা কাপ্তান মালুম ছোকান।

৪। ওঠাও আঁকড়ি লঙ্গর উঠাও বাদাম হৈরে জোয়ান মাস্তুল কামান।

৫। উঠতি চায় না মাস্তুল কামান কর্তা ভারি বোঝা।

সিদ্ধ। গরান কাষ্ঠমত গরায়ে লয়ে চল, জলে নিয়া ফেল, জাহাজের সাথে কাছি দিয়া বাঁধ কৈসে, ভাসাইয়া চল জালি ডিঙ্গার প্রায়, নোনাপানি কালাপানি খাইতে খাইতে চলুক জালিবোট।

বাবু। আর টানা হেচড়া ক্যান, ভাল-মানষের মতো যেতেছি, বন-মনুষ্যের মতো কোমরে দড়ি দাও ক্যান।

॥ বাবুর গীত ॥

হাহা বিষম সাগরে পড়ে হইল মরণ,
কুম্ভীরের পেটে হৈল হৈতে হজম।
এ হালে গেনু মারা ধনজন কোথা রৈল তারা,
এই হৈতে হৈল সারা কপালের লিখন।
কার দুঃখ কেবা দেখে, কে আসিয়া পোছে মোকে,
কুম্ভীরের পেটে কাকে করি জিজ্ঞাসন।

সিদ্ধ। তুমি অতি মূর্খ, ধিয়ান গেয়ান কিছু নাই, চইলা চলো

জলদি কইরা, জাহাজ ধর গিয়া অধিক বাক্যব্যয় করহ বৃথা !
আইসহ, তোমার পক্ষে ডাঙ্গায় থাকা যুক্তিযুক্ত নয় ।

॥ বাবুর গীত ॥

আজ হতে তোমার হাতে আমি সঁপিলাম আমায়,
ওহে দেখো যেন দীন দুঃখী প্রাণে রক্ষা পায় ।
আমার নিশিদিন বিষাদে হে সমভাবে যায়,
তুমি দেখিতেছ সে অবধি আছি যে দশায় ।

॥ সকলের প্রস্থান ॥

মাতৃগুপ্ত

কবি মাতৃগুপ্ত উজ্জয়িনীতে রাজা হর্ষবর্ধনের সভায় অতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন ; রাজার সেবা তিনি প্রাণপণে করছেন, কিন্তু রাজার সুনজর একদিনও তাঁর উপর পড়েছে একথা কেউ বলবে না সেই মলিন মুখ, ছেঁড়া-কাঁথা মাতৃগুপ্তকে দেখে। ঋতুরাজের মতো রাজা হর্ষ সবাইকে সুখের হিল্লোলে পূর্ণ করলেন ; কিন্তু দুঃখ—সে শীতের মতো কবির চারিদিকে জড়িয়ে রইলো। রাজা মাতৃগুপ্তের কবিতা থেকে সেটির ইঙ্গিত পেয়েও উদাসীন রইলেন। এইভাবে কবি কত শীত যে বিনা পুরস্কারে হর্ষবর্ধনের সেবায় কাটালেন তার ঠিক নেই। রাজা যখনই শোধান—'কবি কী সংবাদ ?' কবি উত্তর দেন ছেঁড়া কাঁথা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—'বড় শীত মহারাজ ! হুতাশের গরম নিশ্বাস বুকের মধ্যে না যদি থাকতো, আর যদি হর্ষের কথা দু-একটি মাঝে-মাঝে আগামী বসন্তের আশার মতো শুনতে না পেতেম, তবে নিশ্চয়ই মরেছিলেম।' রাজা মনে মনে কবির কথায় দুঃখ পান ; আর এতদিন কবিকে অনর্থক যে নানা ভোগ ইচ্ছে করে ভোগাচ্ছেন সেটা ভেবেও লজ্জা পান ; কিন্তু মুখে বলেন লক্ষ টাকার কাশ্মীরী শাল নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—'শীত তো মোটেই বোধ হচ্ছে না কবি !' কবি একটু ম্লান হেসে উত্তর করেন—'লোকের হর্ষবর্ধন বসন্ত কাল ; শীতের খবর তো তার কাছে পৌঁছতেই পারে না মহারাজ !'

একদিন বসন্তকালে রাজা উপবনে বিহার করছেন, মলিন মুখে মাতৃগুপ্তকে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে আসতে দেখে রাজা বললেন—

'তুমি ও আমি দুজনে কি আজ সমান সুখী নয়? এই বসন্তকালে শীত তো পালিয়েছে দেশ ছেড়ে, তবে এখনো তোমার মলিন মুখ ছেঁড়া কাঁথা কেন বল তো কবি?' কবি উত্তর দিলেন—'মহারাজ, আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা? আপনি ঐ সম্মুখের ক্রীড়া-পর্বতটির মতো বসন্তের দিনে বিচিত্র বাসন্তী ফুলের সাজে সেজে অপূর্ব শোভা বিস্তার করেছেন; আপনার যশের সৌরভ পেয়ে দিগ্‌দিগন্ত থেকে দেখুন কতো মধুকর এসে গুণগান করছে আজ আপনার চারিদিকে আনন্দে হর্ষের মধুবৃষ্টি করে! আর আমি ঐ হিমাচলটির মতো যে শীতে সেই শীতেই ঘেরা রয়েছি এখনো!'

রাজা বললেন—'তবে কে বড় হল কবি? হিমাচল, না এই ক্রীড়া-পর্বতটি?'

কবি বললেন—'ক্রীড়া-পর্বতটি বসন্তের হর্ষবর্ধন, ফুল-ফলের ঐশ্বর্যে, ছায়ার মহিমায় বড়; আর হিমাচলটি কায়ায় যেমন, তেমনি দুঃখেও বড়, মহারাজ। শীত ওর আর যাবার নয় দেখছি।'

মহারাজ কিছুদিন যুবরাজের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বিশ্রাম করছেন গরমের দিনে; কাঁথাখানা চার পাট করে স্কন্ধে রেখে কবি উপস্থিত বিষম রৌদ্রে খোলা মাথায়! হর্ষবর্ধন বলে উঠলেন—'এতদিনে শীত দূর হল কবিবরের!'

মাতৃগুপ্ত উত্তর করলেন—'মহারাজ, শীত একটু অবসর নিয়েছে বটে, কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মকে এই হতভাগা কবিটিকে পুড়িয়ে মারবার জন্যই রেখে গেছে। শীতের আমলে কেবল কেঁপেই মরতেম, কিন্তু এ-আমলে হৃৎকম্প আর স্বেদ দুইই হচ্ছে; মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ছে মহারাজ!'

রাজা মৃদু হেসে বললেন—'কবিবর, এই কাঁথাটি স্কন্ধে না রেখে ওটির মায়া ত্যাগ করে যদি আমার হাতে সঁপে দাও, তবে ওটি দিয়ে তোমার জন্যে এমন একটি ছাতা বানিয়ে দিতে পারি বেশ বড়গোছের, যার ছায়ায় তুমি সুখে থাকতে পারবে!'

মহারাজের সামনে কবি সেই শতকুটি কাঁথা বিছিয়ে তার উপরে বসে বললেন—'দুঃখের দিনের সম্বল এই কাঁথা দিনে-রাতে শীতে-গ্রীষ্মে কাজ দিচ্ছে এখনো। এমন কি প্রয়োজন হলে মহারাজেরও পদধূলি মুছে নেওয়া কিংবা সিংহাসনের গদির আর এক-পুরু খোলসও করা যায় একে দিয়ে একদিন। কিন্তু ছাতা হলে এই ফুটো-ফাটা কাঁথায় রোদবৃষ্টি মোটেই আটকাবে না; উপরন্তু যে কাজগুলো এখন করছে তাও করতে পারবে না।'

মহারাজ বললেন—'কবিতা আর কাঁথা আর তার উপর আমি ধরলেম ছাতা!' বলে রাজা উঠে কবির মাথায় রাজছত্র ধরলেন। আনন্দে সভাসদ সবাই ধন্য ধন্য বলে উঠল।

কবি ছল-ছল চোখে বললেন—'প্রভু, এ দাসকে কোন্ দূরদেশের রাজছত্রের তলায় নির্বাসন দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাচ্ছেন?'

—'বন্ধু, এইখানে।'—বলে রাজা ছাতা রেখে কবিকে বুকে ধরলেন।

মাতৃগুপ্ত বললেন—'বন্ধু, ছাতার আড়াল সরে গিয়ে তোমার পা পড়েছে দীনের কাঁথায়, অমনি খোলা আঙিনার শেষ পর্যন্ত তোমার ছায়া বিস্তারিত হল দেখ।'

রাজা বললেন—'বন্ধু, এই ক্রীড়া-পর্বতের তপ্ত মাটি ঐ দেখ তোমারও ছায়া পেয়ে অনেক দূর পর্যন্ত শীতল হচ্ছে।'

গ্রীষ্মকাল এইভাবে কাটল। বর্ষা এসে উপস্থিত হল। উজ্জয়িনী রাজপ্রাসাদের চূড়ায় ময়ূর সব পাখা বিস্তার করে মেঘের দিকে চেয়ে কেকারব করছে; আকাশে ইন্দ্রধনু মেঘের উপরে সাত রং নিয়ে ফুটে উঠেছে। রাজা বললেন—'ছাতার দরকার এখনো কি বোধ করছ না কবি?'

কবি বললেন—'এখনো নয় মহারাজ। কেননা এখনো শুনছি ময়ূরেরা বলাবলি করছে—হায়, অসার ইন্দ্রধনুর রং দেখে মেঘ মোহিত হয়ে রইল আর চিত্রবিচিত্র পাখা মেলে আমরা যে তার

গুণগান করে কৃপাবারি ভিক্ষা করছি, তার জন্যে মেঘ পুলকবিন্দু যা দিচ্ছে তাতে তৃষ্ণা মেটা দূরে থাক, পালকগুলো যে ধুয়ে নেব তাও হচ্ছে না। ইন্দ্রদেব যতক্ষণ আকাশ ফুটো করে জল না ঢালছেন ছাতার কথা মনেও আসছে না। এখন কেবল মনে আসছে—সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণম্।'

রাজা বলে উঠলেন—'যদি তাই হয় তবে—বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী, তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ। জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো, দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।'

এই বলে রাজা মাতৃগুপ্তকে একখানি পত্র দিয়ে বললেন—'আমার এই পত্র নিয়ে আপনি কাশ্মীরে গমন করুন এই মুহূর্তে!'

মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বললেন—'কবিবরের যানবাহন পাথেয়—'

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন—'কিছু প্রয়োজন নেই।'

মন্ত্রী অবাক হয়ে কবির দিকে চাইলেন। কবি ছেঁড়া কাঁথায় রাজার শাসন-পত্র বেঁধে নিয়ে পথে বার হলেন—আর কিছু প্রয়োজন নেই বলে।

কবি চলেছেন মেঘে-ছায়া-করা দিনগুলির মধ্যে দিয়ে নদীতীরে-তীরে—গ্রামে গ্রামে বিশ্রাম করে। বনের পথে পাখিদের গান শুনতে শুনতে, মাঠে-ঘাটে নানা ছবি নানা শোভা দেখতে দেখতে সারা পথ তিনি আনন্দে ভরপুর হয়ে চলেছেন। শেষে একদিন দূরে হিমাচলের পায়ের কাছে কাশ্মীরে এসে কবি উপস্থিত। তখন সেখানে ফুলের সময়। কবি দেখলেন সমস্ত দেশ ফুলে ফলে সবুজে যেন একখানি বিচিত্র রাজাসনের মত বিছানো রয়েছে। তার উপর বরফের চূড়া শ্বেত ছত্রটির মত শোভা ধরেছে। কবির পথের ক্লেশ দূর করে পর্বতের বাতাস ফোটা ফুলের সুগন্ধে উপবন আমোদ করছে। ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে মাতৃগুপ্ত সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন; কখন দিন শেষ

হয়ে সন্ধ্যা আসছে তা তাঁর খবরেও আসেনি। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে যেন জেগে উঠলেন—যেন মনে হল একটি সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে গায়ের কাঁথাখানা কারা কেড়ে নিতে যাচ্ছে আর তিনি প্রাণপণ হাঁকছেন—মহারাজ রক্ষে করুন! আমার কাঁথা আমি কিছুতে ছাড়ব না! মহারাজ কিছু বলছেন না, কেবলই হাসছেন।—কবি চেয়ে দেখলেন সত্যিই এক হরিণশিশু তাঁর কাঁথার উপর আরামে মাথাটি রেখে নিদ্রা দিচ্ছে; কবিকে উঠতে দেখে বনের হরিণ পালিয়ে গেল। স্বপ্নের অর্থ ভাবতে ভাবতে মাতৃগুপ্ত সে-রাত্রির মত স্থরপুরের চটিতে এসে আশ্রয় নিলেন। তারপর হর্ষবর্ধনের দানপত্র যথাসময়ে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিয়ে মাতৃগুপ্ত প্রত্যুত্তর চাইলেন। তখন মন্ত্রী কবিকে প্রণাম করে বললেন—'অনুমতি দেন তো অভিষেকের আয়োজন করি। সিংহাসন কেন আর শূন্য থাকে?' কবি আশ্চর্য হয়ে শোধালেন—'কার অভিষেকের অনুমতি চাচ্ছেন আপনি আমার কাছে?'

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—'হে স্থকবি, আপনারই!' কবি বুঝলেন, হর্ষবর্ধন তাঁর মাথায় রাজছত্র না দিয়ে ছাড়লেন না। তিনি মন্ত্রীকে ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়ে বললেন—'মন্ত্রী, এখানা সিংহাসনে বিছিয়ে দিতে বল, আর অভিষেকের আয়োজন করো।'

মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে বসবার অল্পদিন পরে, হর্ষবর্ধন স্বর্গে গেলেন এ-খবর যেদিন কাশ্মীরে পৌঁছল সেইদিন কবি রাজ-ছত্রের মায়া পরিত্যাগ করে ছেঁড়া কাঁথা স্কন্ধে ফেলে যে পথে এসেছিলেন সেই পথে বারাণসীতে চলে গেলেন।

রেনি-ডে

উদ্‌ভুট্টির চরে ঘোরতর বর্ষা। চারিদিকে জল আর জল—কেবল দেখা যাচ্ছে খাতাঞ্চির দপ্তরখানাটি—

কিছু কিছু ইঁট, কিছু কিছু কাঠ
কিছু খোলার চাল, কিছু টিনের ছাত
পুব ধারে উঁচা—পশ্চিম ধারে কাত।

যেন আরারুট পর্বতের চূড়ায় ধরা নোয়ার কিস্তিখানা। জমা-জরিপের কাজ বন্ধ। সোঁতার ভয়ে গাম্ভার কাঠের তক্তার 'পরে খাতাঠাসা কপ্পুর কাঠের সিন্ধুক চাপিয়ে, এক আঁটি বিচিলি চারপাট সতরঞ্চি বিছিয়ে, গদিয়ান হয়ে বসে খাতাঞ্চিমশায় গড়গড়া টানছেন আর এক-একবার তালামুদের বই ওল্টাচ্ছেন।

সোনাতন এসে রিপোর্ট করলে—'ওদিকে ব্রহ্মপুত্রের জল বেড়েছে, এদিকে দামোদরের বাঁধ ভেঙেছে : বৃষ্টির কামাই দেখছিনে!'

—'তারেৎ ব্রহ্মঃ সনাতনঃ, গতিক ভাল বুঝছিনে। বুঝিবা জল-প্লাবনে গোমাতা দোবারা তলান!' বলে খাতাঞ্চিমশায় একমুখ ধুমা ছেড়ে তালামুদের পাতা ওল্টালেন।

সোনাতন বললে—'কর্তা, এমন আজ্ঞা করবেন না; গরু আমি উঁচু জায়গায় বেঁধে থুয়েছি।'

—'আজ্ঞে আমি করবার কে? সবই আল্ মাইতির ইস্‌চে। তিনি যদি রাগত হয়ে থাকেন, তবে কেউ বললে ঠেকাতে পারবে না। জরু-গরু সব ভেসে যাবে মায় উদ্‌ভুট্টির চর,—ওর কি নাম, তোমার রিসিবরও ঠেকাতে পারবে না!'

—'আজ্ঞে কর্তা, আপনি থাকতে আমরা নির্ভয়। লাল মাইতির চিহ্নিত লোক আপনি ; আপনি বললেই—'

—'আ হে, আমি একা কতদিক ঠেকাবো ? পাঁচজনে যে আল্ মাইতিকে চটিয়ে রেখেছে—

বেদশাস্ত্র-বিবাদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্
ইতরেষাং তু মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা।'

—'আজ্ঞে বুঝলাম না তো কর্তা, শোলোকটা ভেঙে কন।'

—'কী আর বলি, বুঝে দেখ গে—

বদ্যি আছেন লগে বেদের টীকে,
গরু খুঁজে মরছে গোবদ্যিকে।
গরু হল গুরু পাঠশালার
মরচে ধরল লাঙলে চাষার।
ভুঁইমালির ছেলে গেল বিলেতে,
শেয়াল-কাঁটা গজায় বেগুন ক্ষেতে।
আল্ মাইতির কত আর সয় ?
রাগে বুঝি এবার করেন প্রলয়।'

—'তাহলে কর্তা ছুটি মঞ্জুর করেন, দেশে গিয়ে জরু-গরু কাচ্ছা-বাচ্ছাগুলোকে দেখে মরি !'

—'আ হে, এ কেমন কথা কও তুমি ? দেশে গেলেই কি আল্ মাইতির রাগ পড়বে ? তাঁর উদার হস্ত এড়াবার জো নেই। ইচ্ছে করলে তিনি তোমার গরু-জরু মায় দেশটারে এইখানেই টেনে এনে ফেলতে পারেন। আল্ মাইতির স্মরণ কর, তারাই এসে পড়বে তোমার খবর নিতে এখানে !'

—'আজ্ঞে, চারদিকে যে জল—আসবে কেমন করে তারা ?'

—'আর তুমিই বা যাবে কেমন করে তাদের কাছে, ছুটি দিলেও ?'

—'তাও তো বটে কর্তা !'

—কর্তা আমি নই, কর্তা আল্ মাইতিকে ডাকো।'

—'তাই যাই কর্তা, লাল মাইতির কাছেই যাই। লাল মাইতির বাসা কোন্ দিগে?'

—'এ বড় শক্ত প্রশ্ন করলে সোনাতন!' বলে খাতাঞ্চিমশায় তালামুদখানা ঝপ্ করে বন্ধ করতেই চালের উপরে বাস্তুঘুঘু ডেকে উঠল—'বৌ বৌ তুঃখু পাওয়ার বৌ—'

খাতাঞ্চি মশায় বললেন—'সোনাতন, দেখ তো আকাশে রামধনু উঠেছে নিশ্চয়!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ তো কর্তা!'

—'তবে আর আল্ মাইতিকে ডেকে বিরক্ত করবার আবশ্যকতা দেখি নে!'

———

চাঁইদাদার গল্প

—'উঃ কলম্বানেবুর গন্ধ পাচ্ছি যে অবুচন্দরবাবু!'

—'এনেছি, তোমার জন্যে এনেছি একটি, চাঁইদাদা।'

—'বিশ্বাস হয় না, এই নড়ায়ের বাজারে কাগজীনেবুই পাচ্ছেন না তোমার চাংড়াদিদি, আর তুমি কিনা পেলে সাত রাজার ধন একটি মানিক :—এ তো দিখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

—'যদি দেখাই আমি?'

—'তবে বখ্‌সিস্‌ দেবো।'

—'কী বখ্‌সিস্‌ আগে বল।'

—'কী বখ্‌সিস্‌ পেলে তুমি খুশি হও?'

—'একটি গল্প।'

—'ভালো তাই সই, নেবু জোগাও, গল্প কই:'

—'এই নাও।'

—'একি, এ যে অপূর্ব জিনিস—আঃ! কোথা হতে পেলে অবুচন্দর!'

—'মাসির দেশ থেকে মাস্‌চটক্‌ মশায় এনেছেন।'

—'ও বুঝেচি, রাখ নেবুটি আমার এই গের্দার তলায় লুকিয়ে. তোমার চাংড়াদিদি দেখলে টেনে ফেলে দেবে!'

—'কেন বেশ তো খোসবো নেবুর!'

—'আরে দাদা, তোমার কাছে বেশ, আমার কাছেও বেশ—চাংড়ার কাছে ভারি নোংরা।'

—'এ কেমন কথা?'

—'আ হে অবুবাবু, সে যে কুলীনের মেয়ে।'

—'বুঝলেম না কিচ্ছু।'

—'বুঝবে বুঝবে, আর একটু বড় হও বুঝিয়ে দেবো। এখন গল্প শুনবে তো তল্প নাও, জল্পনা রাখ, কল্পনা কর—অল্পসল্প!'

—'কল্পনা করতে তো আমি জানিনে চাঁইদাদা।'

—'তা ঠিক, তুমি যে আজকালকার ছেলে—হিস্টিরি পড়ে কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে?'

—'তবে?'

—'তবে আবার! দ্যাখো অবুবাবু এই আমি সেকালের বুড়ো—হিস্টিরি-পড়া মানুষ নয়, তাই কল্পনা করতে আমার ঠেকে না একেবারেই '

—'চাঁইদাদা, তোমাব কথা শুনতে শুনতে আমার ঘুম পেয়ে এল।'

—'ঘুম পায় ঘুমোবে; কিন্তু খবরদার হাই তুলো না—তাহলেই আমার কল্পনা আব চলবে না, রাস্তার মাঝে পা পিছলে একদম আলুব দম হয়ে যাবে।—তখন কী কববে অবুবাবু?'

—'মুখে ভরে দেবো ছুট্‌ মাসির ঘবে।'

—'বটে বটে, তুমি আমারই একজন বটে—কল্পনা করার শক্তি আছে দেখছি তোমার কিছু-কিছু!

—'শোনো তবে বলি।

সেকালের পাণ্ডববর্জিত দেশের একটা বুড়ো শকুনি করেছে তাড়া এক বাজপাখিকে ধরবার মৎলবে। বাজপাখি সড়াৎ করে সাদা কালো ডানায় ঝিলিক টেনে তো হোক অদৃশ্য: শকুনি শূন্যে শূন্যে তিন-চারটে মস্ত চক্কর খেয়ে উড়ে বসবি তো বোস, ভুচুর রাজার ঘরের মটকায়; বসেই তো বাছতে লেগেছে বুড়ো শকুন ডানার উকুন। এদিকে রাজবাড়িতে সোরগোল পড়ে গেছে।

—কী পোলোরে চালে, কী পোলো!

চিল পোলো না শিল পোলো না ইঁট পোলো !

রানীর চাকরানী পুকুরঘাটে বাসন মাজছিল। সে বলে উঠলো,
—চিল পোলো গো চিল পোলো !

—দেখ দেখ শঙ্খচিল না তো !

—ওমা ! চিল হতে যাবে কেন—ওটা যে শকুনি !

শকুনি বলে শকুনি ? শকুনির মামা শকুনি !—ডানা মেলে পালক থেকে কাঁকড়ার মতো বড় বড় উকুন বেছে খাচ্ছে। তাড়ালে নড়ে না।

—কী হবে গো ও পিসিমা !

রাজার পিসি কাত্যায়নী গম্ভীর মুখে বললেন—যখন পড়েছে তখন ওরে নড়ানো শক্ত, ও কিছু নিয়ে তবে উড়বে।

ছোটপিসি দাক্ষায়ণী বললেন, এ তো বড় দোষের কথা হল :—

আজ মটকাতে পড়ে শকুন—
ঠোঁটে বেছে খেলে উকুন।
কাল বাড়া ভাতে পড়বে মাছি,
তখন আর কোথায় আছি ॥

এই সময় খবর আনলে ডুমনিপাড়ার কুসমি—'ওগো মাঠাকরুনেরা আপদ ঢুকেছে—শুকুনিটা যেখানেই পড়লো সেখানেই তিনটে খাবি খেয়ে মরলো। রাজা আমাদের তেনাকে হুকুম করলো মরা পাখিটারে ভেজে খেয়ে ফেলাতে।

ঐ শোনাও যা, কাত্যায়নী ঠাকরুন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে—অ্যাঁ, বলেই চিৎপাৎ কুপোকাৎ—আর সাড়াশব্দ নেই।

রাজার রানী আরামের নিশ্বাস ফেলে বললেন—যাক পিসিব উপর দিয়েই শকুন-পড়ার ফাঁড়াটা কাটলো বুঝি!

ঠিক সেইকালে কাত্যায়নী বুড়ি চোখ মেলে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে ভাঙা কাঁসির মতো খনখনে আবাজে বলে উঠলেন—তিরদোষ তিরদোষ তিরদোষ,—তিনবারের বার চোখ উলটিয়ে পিসির হয়ে গেল।

সে মাসটা গেল ত্রিদোষ কাটাতে। পরের মাসে ঠিক সেই দিনে সেই সময়ে পড়লো জোড়া শকুনি রাজবাড়ির চালে—এমন জোরে যে মটকা কাত, শকুনিদুটোরও অপঘাত।

—এবার কার পাল।—বলে রানী দাক্ষায়ণী পিসির দিকে চাইতেই রাজার ছোট পিসি দাক্ষায়ণী বললেন—পালা যারই হোক, এক পলা তেল দ্যাও—পুকুরে তিনটে ডুব দিয়ে একবার শুদ্ধ হয়ে আসি। ছোটপিসি কালীসায়ারে ডুব দিতে সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। কেউ বলে পিসি পেলিয়েছেন, কেউ বলে কুমিরের পেটে গেছেন। জাল টানা হল—কালীসায়ারে। পিসি না উঠে উঠলো জালে একটা রাঘব বোয়াল—মরে দাঁত ছিরকুটে আছে। খোঁজ খোঁজ—পিসি গেল কোথায়? সন্ধান মিললো গিয়ে পিসির বনগাঁয়ে। সেখানে বসে আছেন রাজার পিসি চানাচুর ভাজার ঠোঙা হাতে—পাশে তাঁর বোষ্টমী মাসি খঞ্জনী বাজিয়ে ধরেছেন গীত :—

নিপট নিরদয় তোমায় দয়াময়
বলাও বল কে ন্‌ গুণে!

হয়ে রাজকন্যে বনবাসী,
দাসী হয় রাজমহিষী,
—সকলই তোমার কৃপায়!
যারে রাখো পায়, সে কী না পায়,
যারে না রাখো পায়,
বিপদ ঘটাও পায় পায়;
হাসি পায় হে পায়,
পায়ে ধরার দিন মনে হলে ॥

—ওকি অবুবাবু, হাই তুললে যে?'

—'কী জানি চাঁইদাদা, তোমার গান শুনে হাসি চাপতে গিয়ে হাই তুলে ফেললুম।'

—'তাহলে আর গল্প চললো না, অবুবাবু! কল্পনার হিস্টিরিয়া হয়েছে—যা তা আবোল তাবোল বকছে সারা রাত—তুমি আজ ঘরে যাও, কাল এসো ঠিক এই সময়ে।'

—'কালও কি নেবু আনতে হবে?'

—'জোর জুলুম করতে চাইনে। পাও যদি এনো—কিন্তু গোপনে,—চ্যাংড়া না টের পায়।'

—'আচ্ছা।'

শিব-সদাগর
চর্ভটি নাটক

স্থান—হলদিগুঁড়ির মাঠের চৌবাড়ি। কাল—বাদলার দিন।

পাত্র—তোতা, ভোঁতা, ইচিং, বিচিং, চাঁচি, মুচি, শিব-সদাগর, ভালুক।

এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গা বান ডেকেছে। হলদে পুঁথির পাতাখানির মতো হলদিগুঁড়ির মাঠ আধখানা ডুবে গিয়েছে। দূরে একখানা গাধা-বোট বাঁধা, পাঠশালার দাওয়ায় বসে পোড়োরা সেইদিকে চেয়ে আছে—আর বলাবলি করছে—

তোতা। (স্লেটপেন্সিল চুষতে চুষতে) গুরু এলেন না, পড়ার কী করা যায়?

চাঁচি। (মাথা চুলকে) তা হলে গুরুর কাছে নাহয় আমরাই যাই।

ইচিং। তোর তো খুব বিদ্যে, গুরু যদি বানে ভেসে যেয়ে থাকে!

বিচিং। গুরুর সঙ্গে আমরাও ডুববো নাকি?

তোতা। বা রে, চুপ রলি যে? এর একটা জবাব দে না।

চাঁচি। গুরু কি নৌকো না জাহাজ যে বানে ভেসে যাবে?

বিচিং। কেন ভাসবে না? বানে গরু ভাসে, গ্রাম ভাসে—

মুচি। গোষ্ঠ গোয়াল পর্যন্ত ভাসতে পারে, আর গুরু ভাসতে পারেন না, গুরু কি এতই ভারি?

ইচিং। সেবারের বানে লোহার পুলটা পর্যন্ত ভেসে গেল, দেখিসনি?

বিচিং। আর ধোপাদের কাপড়-কাচা পাথরটা যে এই পাঠশালায় এসে ঠেকল, তার কী?

চাঁচি। তা তো দেখছি, কিন্তু গুরু তো কোনো ধাতু নন, তিনি পাথরও—

তোতা। তবে কী তিনি? ধাতু পাথর নন তো কী, বল্‌ না?— গো ধাতুতে রু-প্রত্যয় করলে গুরু হয় না?

চাঁচি। দাদা, মুগ্ধবোধ আমি পড়িনি তো।

তোতা। প্রস্তর গুরুভার, এটা তো পড়েছ? গুরু পাথর কি না, বলবার পূর্বে সেটা তো ভাবা উচিত ছিল। গুরু-বন্দনাটা মনে নেই কি?—

'বন্দি গুরু, গুরু বলে তাঁহাকেই মানি
পিতলে করিয়ে সোনা সে পরশমণি।'

চাঁচি। তোমরা যাই বল, আমার কিন্তু কিছুতে প্রত্যয় হচ্ছে না যে গুরু যিনি, তিনি ভাসতে পারেন।

তোতা। কেন প্রত্যয় হবে না? লঘু-কৌমুদীতে লিখছে, গো ধাতু রু-প্রত্যয়—

চাঁচি। তোমার লঘু-কৌমুদী যাই বলুক, আমি বলছি, গুরু কখনো ভাসতে পারে না।

সকলে। বললেই তো হল না, প্রমাণ দাও।

চাঁচি। 'শিলা জলে ভেসে যায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

তোতা। (চাঁচির কান মলে) বড় যে পণ্ডিত হয়েছিস, পিতলের কলসি ভাসে কেন?

চাঁচি। ফাঁপা বলেই ভাসে, নিরেট হলে ডুবে যেতো—ভারি হয়ে।

তোতা। আর মাল-বোঝাই জাহাজ ভাসে কেমন করে রে ভোঁতা?

কান মলন

চাঁচি। (রেগে) গুরুকে তুই কলের জাহাজ বলিস?

তোতা। (গম্ভীর স্বরে) মনে রেখো তিনি বিদ্যের জাহাজ, তাই ভেসে গেলেও যেতে পারেন।

ভোঁতার প্রবেশ

ভোঁতা। যাক, পুঁথিপাটা বানে ভাসিয়ে এসেছি, এখন গুরুমশায়টাও ভাসিয়ে দিতে পারলেই হয়।

তোতা। ভোঁতা, তুই যে কাদা মেখে একেবারে ভূত হয়ে এলি!— গুরু এসে বলবেন কী?

ভোঁতা। কাদা মাখবো না?—কত দিনের কাঠ-ফাটা রোদের পর মাঠের মধ্যে আজ বিষ্টি পেলুম! দৌড়ে পালাবো, আর বসু-মাতার কোলে পিছলে পড়ে গেলুম। আঃ, কী ঠাণ্ডা কোল রে দাদা, মনে হল যেন চন্দনের হ্রদে ডুব দিয়েছি! গুরুমশায়টা পিছনে-পিছনে এসেছিল, কাদার ভয়ে যেমন হ্রদটা ডিঙিয়ে পড়েছে, অমনি একেবারে অকূল পাথারে হাবুডুবু খেতে খেতে কোথায় যে তলিয়ে গেল, টিকিও দেখলুম না। কেবল তার ভাঙা ছাতাটা উল্টে পড়ে আকাশের দিকে মাস্তুল তুলে নৌকোর মত ভাসতে-ভাসতে চলল।

তোতা। অতটুকখানি গুরু তলিয়ে গেলেন, আর অতবড় ছাতাটা ভেসে রইল? তোর তো খুব বিদ্যে দেখতে পাই রে ভোঁতা!

ভোঁতা। গুরু যা তা তো তলাবেই, আর লঘু যা তা তো ভাসবেই।

ইচিং। ঐ তো গুরুর লঘু-কৌমুদীখানা জলে দিলুম, ভাসলো কোথায়?

ভোঁতা। আরে ইচিং, ওটা নামেই লঘু, ভিতরটা এ-ধাতু সে-ধাতুতে একেবারে নিরেট আর ভারি শক্ত, ওটাকে টুকরো-টুকরো করে পাতাগুলোর নৌকো করে দ্যাখ্, ও ঠিক ভাসবে।

বিচিং। তাই তো, ফুঁ দিলেও যে উড়ছে এবারে!

চাঁচি। যাঃ ফুঃ, যাঃ ফুঃ!

মুচি। বাহবা! ঠিক যেন উড়ো-জাহাজ!

তোতা। মুচি, তুই যে বললি উড়ো-জাহাজ! জাহাজ কখনো ওড়ে?

মুচি। ওড়ে না তো কী? ফুঃ, এই দ্যাখ্ উড়ছে।

তোতা। আর ঐ দ্যাখ্ পড়ছে।

ভোঁতা। পুঁথির পাতা, পড়াই তো ওর ধর্ম। হত গাছের পাতা তো দেখছিস প্রজাপতির মতো উড়ে চলত।

তোতা। গুরু আসুন, বলে দেবো, পুঁথির পাতা ছিঁড়েছ।

সকলে। আজ আর গুরু এলো না, চল্, কাপাসি-বনে গিয়ে পাতা ওড়াই গে।

তোতা। আর পাতা উড়িয়ে কাজ নেই। ছাতা আসছে চিনতে পারছ কার?

ভোঁতা। ও সেই ভাঙা ছাতাটা জাহাজের মতো ভেসে চলেছে— গুরু তো নেই।

তোতা। ঐ ছাতার মাস্তুল ধরে নিশেনের মতো—ওটা তবে কী?

ভোঁতা। আর দেরি না, বসে যাও সব পুঁথি নিয়ে—অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে—

ইচিং। দুর্জন, দুর্ঘটনা—

চাঁচি, মুচি। ছত্র, পত্র—

ভোঁতা। গৃধ্র, ধ্রুব—

তোতা। আপ্যায়ন—আপ্যায়িত—

ভোঁতা। রাখালদের বিদ্যালয় তাহাদের বাড়ি হইতে অনেক দূর।

তোতা। সুশীল বিদ্যালয় হইতে আসিয়া বলিল, 'মা পক্ক আম্র দাও।'

ভোঁতা। মা তাহাকে টোকো আমড়া দিলেন।

তোতা। পিঞ্জর, মুদ্গর, বিদ্যালয়—

ইচিং। লাঞ্ছনা—

তোতা। পলাণ্ডু, শাল্মলী, টিট্টিভ—

বিচিং। ঠাট্টা—

ভোঁতা। পলাণ্ডু পেঁয়াজ ভিন্ন আর কিছু নয়।

তোতা। কপিত্থ, বল্গা, উদ্‌ঘাটন, উদ্ভব, অব্দ, আস্পদ, লুব্ধ—

চাঁচি। অদ্ভুত, রম্ভা—

মুচি। কচ্ছপ—

ভোঁতা। কচ্ছপকে সোজা কথায় কাছিম বলে :

তোতা। চৈত্র, চক্র, বক্র, নক্র, তক্র, আস্ফালন—

মুচি। উল্টা, পাল্টা, ভেল্কি—

ইচিং। ইষ্টক, কাষ্ঠ, কষ্ট, চেষ্টা, বাষ্প, নিষ্ফল—

বিচিং। কাষ্ঠ তুলিয়া রাখ।

ভোঁতা। মা কাষ্ঠের জ্বালে ডাল রাঁধে।

তোতা। অস্ফুট, অব্দ, শব্দ—

ভোঁতা। আমাদের দেশে একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহারা যাহা পড়াও, ঠিক তাহাই পড়ে।

ভোঁতা। স্বর্গের পাখি এ দেশে পাওয়া যায় না।

ইচিং। ঐ যে ছেলেটির কাঁধ হইতে ঝুলি ঝুলিতেছে—

বিচিং। ও তো গুরুমশায় নয়!

চাঁচি। তবে কে ও দাদা?

ভোঁতা। ছেলেধরা না তো?

তোতা। রাম রাম—গড়ুর গড়ুর!

চাঁচি, মুচি। ছাতাটা কিন্তু গুরুমশায়ের বটে!

ইচিং। দুর! দেখছিস নে ওটা গোলপাতার, যেন বাতাসে নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠেছে।

বিচিং। ঐ গ্যাখ্, বানের জল ওকে তাড়া করে সঙ্গে আসছে,—গুরু না হয়ে যায় না।

ভোঁতা। শিব-সদাগরের মস্ত দাড়ি, লম্বা জটা।

মুচি। এর চুল জট-পাকানো, কিন্তু দাড়ি নেই দাদা।

তোতা। ষষ্ঠীবুড়ি না তো?

ইচিং। তা হতে পারে।

ভোঁতা। তোদের যেমন বুদ্ধি! ঐ কি ষষ্ঠীর চেহারা? তিনি জোড়-বেড়ালে চেপে আসেন, এর সঙ্গে গ্যাখ্ না, কত বড় একটা কুকুর আসছে!

তোতা। নিশ্চয় যমদূত। না হলে কুকুর থাকে কেন ?

ভোঁতা। আমারও তো পোষা কুকুর আছে, তবে বল্, আমি যমদূত ?

(নেপথ্যে কুকুর)। হো, হো, হো !

মুচি। ভাই শুনলি, মানুষটা ডাকল কুঁকড়োর মতো, আর মানুষের মতো হাঁক দিলে কুকুরটা !

ভোঁতা। ওরে, ওটা কুকুর নয়, সাদায়-কালোয় ভালুক, ঠিক যেন গুরুর মতো চলছে !

ভালুক সঙ্গে শিব-সদাগরের প্রবেশ

শিব। ছেলেরা সব পড়তে চল।

তোতা। গুরু কোথায় ?

শিব। সে-গুরুটি বানে ভেসে গেছে ; তার জায়গায় আমরা দুই গুরু এসেছি।

মুচি। তবে যে ভোঁতা দাদা বললে, তুমি শিব-সদাগর ?

শিব। আমার এক নাম শিব, এক নাম পতিত, এক নাম পাবন ; যে-নামে খুশি আমায় ডাকতে পারো, মানা নেই।

সকলে। পতিত পাবন, শিব সদাগর !

তোতা। সদাগর মহাশয়, ইহারা পুস্তকের পত্র লইয়া উড্ডীয়মান ব্যোমযান, না না—জাহাজ, না না—পুষ্পকরথ, না না—তরী প্রস্তুত করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। আমি বারংবার ইহাদিগকে ও-প্রকার আস্ফালন করিতে লুব্ধ ;দেখিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া এস্থান হইতে উত্থান করিয়াই আপনাকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি।

শিব। তোমার নাম কী হে ছোকরা ?

তোতা। আমার নাম তোতারাম, পিতার নাম আত্মারাম, পিতামহের নাম ননীরাম, প্রপিতামহের নাম বলরাম, তস্য পিতা—

শিব। থাক, সাধু-ভাষায় তোমার খুবই দখল জন্মেছে। এখন নতুন পাঠ নাও। ধরো নিজের কান—চেঁচিয়ে বলো—

এক হাত তোতারাম দুই হাত শিং
নাচে তোতারাম তা ধিং ধিং ॥

—যাও ছেলেরা, বিদ্যালয়ের ছুটি, এখন হাডুডুডু খেল গিয়ে। আমরা ততক্ষণ একটু ঘরের মধ্যে গিয়ে আরাম করি।

প্রস্থান

সকলে। ও ভাই! এত হাত তোতারাম, দুই হাত শিং—হাডুডুডু দুই হাত শিং।

তোতা। আমি বামুনের ছেলে, তোরা আমাকে গরু বললি?

ভালুক। চোপরাও, ধর কান।

প্রস্থান

তোতা। এক হাত তোতারাম, দুই হাত শিং, আমি গরু তোরা রাখাল, চল্ আমাকে উদিকে চরাবি, এখানে ভালুক আছে।

সকলে। হাডুডুডু—দুই হাত শিং, হাডুডুডু—নাচে তোতারাম, হাডুডুডু—তাধিন্ ধিন্।

তোতা। ছেলেধরাটা ঘরে গেছে—এইবেলা সকলে মিলিয়া পলায়ন করি আইস।

(নেপথ্যে ভালুক)। আবার সাধু-ভাষা? চোপরাও!

তোতা। হাডুডুডু ভোঁতা, ঘুলঘুলি দিয়ে ছাখ্ না ওরা কী করছে, হাডুডুডু—

ভোঁতা। আমার ঘাড়ে একটি বই মাথা নেই, তুমি দেখ না, তোমার তবু দুটো শিং আছে!

তোতা। ইচিং বিচিং, তোরা ছাখ্ না, ভারি মজা দেখতে পাবি, আমি বলছি।

ইচিং, বিচিং। তোতা দাদা, তুমি সদ্দার-পোড়ো থাকতে আমরা এগোবো কেন?

মুচি। চাঁচিকে যদি সদ্দার করো তো আমি যেতে পারি।

তোতা। আচ্ছা তাই হবে, যা তো এখন।

মুচি। (ঘুলঘুলিতে দেখে) ভাই, শিব-সদাগর সব রং-করা ছবির বই বার করেছে!

সকলে। ছ্যাখ্ না, আরো কী বার করে!

মুচি। (দেখে) ভাই, চারটে মাটির ঢেলা রেখে ফুঁ দিলে আর অমনি সে-চারটে ঘোড়া হয়ে আগডুম বাগডুম খেলতে লেগে গেল!

ভোঁতা। বলিস কী রে? এবারের গুরু তো ভালো হয়েছে! সর্ না তুই, দেখি! ওঃ, ভালুকটা টুমটুমি বাজাচ্ছে—একটা ছিপ বেরলো—একটা বাঁশি, একটা কাঁচের গোলা—

সকলে। আমাদের দেখতে দে না! (ঠেলাঠেলি)—টিনের মাছ, ঘেঁচি কড়ি, বনমানুষের হাড়, একটা কামান, টিয়ে পাখি—

তোতা। আমি দেখব না বুঝি? সর্ তোরা—(ঘরে কামানের শব্দ) গেছি রে গেছি!— (পতন)

শিব। তোতা, কী দেখছিলে?

তোতা। আমি না, ভোঁতা।

ভোঁতা। আমরা সবাই দেখেছি; সব-আগে দেখেছে মুচি, সবশেষে তোতাদাদা।

শিব। তাহলে মুচি হল ফার্স্ট, ভোঁতা হল সেকেণ্ড, ইচিং বিচিং হল থার্ড, তোতা হল লাস্ট, চাঁচি হল ফেল।

তোতা। চললুম আমি বাবাকে বলে দিতে, কালই অন্য স্কুলে ভর্তি হবো!

শিব। বানে পথ-ঘাট ভেসে গেছে, যাবে কেমন করে?

তোতা। বাবা পাল্কি হয়ত এতক্ষণ পাঠিয়েছে।

শিব। ইচিং, বিচিং, তোমরা?

ইচিং, বিচিং। আমরা সাঁতরে বাড়ি যাব।

শিব। চাঁচি, মুচি, তোমরা?

চাঁচি, মুচি। আমরা বাঁশ ধরে ভাসতে-ভাসতে যাব।

ভোঁতা। আর আমি কাল যখন বান সরে যাবে, তখন কাপড় জুতো পোঁটলা বেঁধে মাথায় নিয়ে বড়রাস্তা ঘুরে বাড়ি যাব।

শিব। ভোঁতা, তোমার বাবা কী করেন?

ভোঁতা। আমরা চাষা, চাষবাস করি।

শিব। ইচিং বিচিং, চাঁচি মুচি?

সকলে। আমরা—কামার, কুমোর, হাড়ি, মুচি।

শিব। তোতা, তুমি?

তোতা। আমরা সাত পুরুষ রাজার সভাপণ্ডিত আর গোপালভাঁড়, কুলীন ব্রাহ্মণ—এই সব ছোট জাতের সঙ্গে বসলে ঘরে গিয়ে আমাদের চান করতে হয়। আমি লাস্ট হয়ে ওদের নিচে পড়ব? চললুম রাজার কাছে নালিস করতে!

প্রস্থান

ভোঁতা। এইবার রাজার পেয়াদা এসে ধরলে সবাইকে!

চাঁচি, মুচি। আমাদের মারবে!

ইচিং, বিচিং। এই বেলা পালাই চল্!

ভোঁতা। পালাবি কোথায়! ফটিক-রাজার জমিদারি ছেড়ে কি যেতে পারবি?

মুচি। আমি যদি পাখি হতুম তো কোনো ভয় থাকত না।

চাঁচি। গাছ হয়ে গেলেও মন্দ হত না।

ভোঁতা। পাখি-ধরা ফাঁদ, গাছকাটা কুড়ুল নিয়ে রাজার লোক বসে নেই ভাবছিস?

ইচিং। জলের মাছ হলে কেমন হয়?

বিচিং। মন্দ হয়না কিন্তু।

শিব। দেখছ তো ছিপ আর জাল!

ভোঁতা। সর্বনাশ! ডাঙায় উঠে খাবি খেয়ে মরতে হবে যে!

সকলে। পতিতপাবন, তুমি বল না, কী হওয়া যায়?

শিব। সবচেয়ে ভালো হয় মাটির ঢেলা হলে, কী বল?

চাঁচি। পায়ের তলায় যে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবে রাজার পেয়াদা!

শিব। হরিণ হয়ে দৌড় দিলে কেমন হয়?

মুচি। ডালকুত্তা ছেড়ে দেবে তাড়া করতে।

শিব। তা তো বটে। আচ্ছা, যদি শক্ত লোহা হয়ে যাওয়া যায়?

ইচিং। ও বাবা, তাহলে হয়ত আমার বাবাকে দিয়েই রাজার পেয়াদা আমায় আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে সোজা করে দেবে!

বিচিং। সবচেয়ে ভালো হত—যদি ক-জনেই রাজার পেয়াদা হয়ে পড়তে পারতুম। যা খুশি করো, কাউকে ভয় নেই।

শিব। তা তো হয় না, সবাই পেয়াদা হলে ধরাধরি চলে কী করে?

ভোঁতা। তার চেয়ে আমরা পেয়াদা, আর পেয়াদাগুলো আমরা হলে কেমন হয়?

শিব। মজা খুবই হয়; কিন্তু তা তো হতে চাইবে না পেয়াদারা! ইচ্ছে করে ধনে প্রাণে কেন তারা মরতে যাবে—ভোঁতার শখ মেটাতে? সে হয় না। আমি আর-এক মতলব ঠাউরেছি—চল সবাই শিব-সদাগর হয়ে ভেসে পড়ি। বিদেশে বিদেশে বাণিজ্য করে বেড়াবো, পাল তুলে দেবো, জাহাজ দেখতে দেখতে সমুদ্রের ওপারে চলে যাবে—ফটিক-রাজার জমিদারি ছেড়ে একেবারে বাদশার মুল্লুকে।

ইচিং। সাঁৎরে যদি তারা ধরতে আসে?

শিব। হাঙরের পেটে যাবে।

বিচিং। পান্‌সি করে যদি তাড়া করে?

শিব। শিব-সদাগরের জাহাজের কাছে পান্‌সি? যেমন গঙ্গাসাগরে পড়বে অমনি ভুস্ করে ডুবে যাবে সব পান্‌সি—মায় সোয়ারি পেয়াদা।

ভোঁতা। তবে আর দেরি না, বাণিজ্যে যাওয়াই ঠিক।

শিব। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

মুচি। ঐ শোন, পেয়াদা হাঁকছে—হুকুমদার।

শিব। চট্‌পট্‌ দাওয়াতে উঠে বসো। এইবার আমি বাঁশি দেবো। জাহাজ ছাড়বে। নাও সবাই দাঁড় ধরো—গুরুমশায়ের বেত-কগাছা দাঁড় হবে। ভোঁতা, তোমার চাদরখানা মোটা আছে, দক্ষিণের খোঁটায় পাল করে খাটিয়ে দাও, আমি হাল ধরছি। দেখো, কখানা দাঁড় ঠিক তালে-তালে পড়ে।

দিনরাত দিনরাত আসছে তরী দিনরাত।
দিনরাত দিনরাত যাচ্ছে তরী দিনরাত।
ঘাটে ঘাটে খেয়া দিয়ে
জমিয়ে পাড়ি যাত্রী নিয়ে,
খুলছে তরী ভিড়ছে তরী দেশবিদেশে দিনরাত।

ভোঁতা। রান্নার জোগাড় কিছু তো নেওয়া হল না। কাউকে বলেও যাওয়া হল না।

শিব। রান্না ঐ ভালুকটা করবে এখন। কিন্তু বলে যেতে গেলে জোয়ার থাকবে না—ভাঁটার টানে নৌকো কাদায় ঠেকবে।

ভোঁতা। তবে কাজ নেই, যেমন আছি, তেমনই চলো। দাও পাল তুলে সকলে—জোর্‌সে টানো দাঁড়।

ভালুক। একটা নিশেন তো চাই। আমার এই ছালটা ঝুলিয়ে দাও মট্‌কায়। জলে ভিজেছে, একটু রোদ বাতাসে শুকিয়ে নেওয়া ভালো।

সকলে। ও ভাই ছ্যাখ্‌!

ভোঁতা। ছালের ভিতর থেকে যেন আমাদের গুরুমশায় ছোট্টটি হয়ে বেরিয়ে আসছেন!

গুরু। কি রে ভোঁতা, দেখে ভয় করছে নাকি?

ভোঁতা। কিছু না।

ইচিং। ভারি হাসি পাচ্ছে—ফুঃ।

গুরু। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সকল কথায় দ্বন্দ্ব,
ছেলেতে ছেলেতে কথা সকল কথায় ছন্দ !

ভোঁতা। শোলোক-মোলোক বাঁশের গোঁজা।
ইচিং, বিচিং। ভাতটি খেলে পেটটি সোজা।
চাঁচি, মুচি। পানটি খেলে আরো মজা ! হো হো হো—

সকলের হাস্য

গুরু। বুড়োয় বুড়োয় কথা সকল কথায় কাশি,
যুবোয় যুবোয় কথা সকল কথায় হাসি।

শিব। ধরো গান, ছাড়ো জাহাজ, বাজাও টুমটুমি—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

শিব-সদাগর তুই নি সোদর ভাই !
মেঘরাজা রে, তুই নি সোদর ভাই !
এক ঝড়ি মেঘ দেও, ভিজ্জে ঘর যাই ॥
ভিজ্জে ঘরে যাইতে যাইতে মায় না দিল ঠাঁই—
লাথি দিয়ে ফালাইয়া দিল কচু ক্ষেতের পাই।
দাদা কচু ক্ষেতের পাই ॥
কচু ক্ষেতের পানি যেমন টল্‌মল্‌ করে,
মার চক্ষের পানি ফুটি বুক ভাসিয়া পরে—
রে—রে—রে—রে ॥

সকলে মিলে দাঁড় টেনে গান গাইছে, বানে চৌবাড়ির চালাখানা দুলতে দুলতে ভেসে চলল। দূরে পেয়াদা হাঁকলে—হুকুমদার !

সিকস্তি পয়স্তি কথা

১

অস্তি পয়স্তি চরের একফালি সিকস্তি সরু
তদুপরি আছে খাড়া একটি গভস্তি তরু।
ফল তার নাস্তি—থাকলেও ছোঁয়না মানুষ কি গরু।
সেখানে একটি খুদ্দুর বস্তি
বেঁধেছে ক-ঘর গৃহিস্তি।
রাস্তা সেখানে একটা অস্তি—দেখা যায়না এমন সরু।
বস্তির পশ্চিমে পানা পুকুর
ডোবা বললেও হবে না ভুল :
পুবেতে বালুচর
নাই বাড়িঘর—ছাহারা মরু।
রাস্তার বাঁয়ে তাঁত-শাল,
ধ্বসে পড়ছে তার মেটে দেয়াল,
তাঁতির নেই খেয়াল—খড়ের চাল যদিও করছে উড়ু-উড়ু।
সে ভাবছে কেবল, সুতো কাটতে পারছে না
হাতিপাড় বাঁধতে তার জরু।
ডাহিন হাতে কামার-শাল
লোহাকে পিটিয়ে সে করে লাল,
গড়ে শাবল, কোদাল, লাঙলের ফাল,
খোন্তা খুন্তি—অগুন্তি॥
শুধু নরুনটির ধার বসাতে ঘেমে অস্থির লোহারু।
সিকস্তি চরের কুমোর
তার ছিল ভারি গুমোর—
ঘুরাতো চাকটি
বারাতো কুঁজাটি, আসটি—পেট-মোটা, গলাটি সরু।

ভাবনা ঢুকেছে তার,
চিনেমাটির পেয়ালাটার
ফরমাস দিয়ে গেছে বেলেস্তার বাবুর বেলাতি বারু।
সেদিন বসেছে মাত্র একখানি মুদির দোকান
পথিকে তেলেভাজা ফুলুরির দিতে জোগান
মহানন্দের 'আনন্দ ক্যাবিন'
সাইনে লেখা নাম—তেলরং দিয়ে বাঁকাচোরা মোটা সরু।
মুদি ছিল এককালে মাইনর ইস্কুলের পড়ু।
মুদির ঘরের কাছে
জাবর কাটতে আছে
অস্থিসার কার হারানো গরু।

এখন এই চর তদারকে খুদিরাম বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে খাতাঞ্চি-মশায় এই মুদির দোকানে বাসা নিয়েছেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে খাতাঞ্চিমশায় মশার জ্বালায় ভোরে ফরাগৎ হয়ে মুদির দাওয়ায় বসে কুল্লি করছেন। লাল গামছা আর ভিঙ্গার নিয়ে খুদিরাম বিশ্বাস দাঁড়িয়ে। কিছু অন্তরে মুচির হাতা—সেখানে চিনিবাস মুচি খাতাঞ্চিমশায়ের তুপাটি জুতোর গোড়ালিতে তুখানা গরুর নাল আঁটছে—পিতলের গুঁজি ঠুকে ঠুকে। আকাশ তখনো ফর্সা হয়নি—আবছা দেখা যাচ্ছে। মুদির বাড়ির একধারে একটা মুরগি রাখবার ফুটো জালা, একঝাড় জল-বিচুটি। এমন সময়—

রামপাখি ডাকিল যেমন—ক-কুত্র
অমনি উঠিল প্রভাত তপন, ধরে সেই সুরের সূত্র।
কুড়ুক কুক্কুটি
ডানা ঝাড়ি উঠি—
জল বিচুটির ঝাড়ে বাওয়া ডিম্বটি পাড়িল ক্ষুদ্র।

রামপাখি ডেকেই চলেছে—ধুপ্পু টাহুঁ ধুপ্পু টাহুঁ—গলা ছেড়ে।

খুদিরাম খাতাঞ্চিমশায়ের চিবোনো আধখানা গাব-ভেরেণ্ডার

দাঁতন-কাঠি রামপাখিটার দিকে ছুঁড়ে বললে—'কুঁকড়োটার গলা দেখ, যেন বাঁদিদের ধমকাচ্ছেন নবাব খাঞ্জা খাঁ !'

—'ধমকাচ্ছে কি রাম নাম করছে, কেমন করে বুঝলে খুদিরাম ?'

—'আজ্ঞে, মোচলমানের পাখি রাম নাম করে কখনো ?'

কুঁকড়ো তখন দাঁতন-কাঠিটার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলছে—লাল ঝোঁট দুলিয়ে। খাতাঞ্চিমশায় শব্দের দিকে কান পেতে বললেন—'পাখিটা কৃষ্ট বলছে না খৃষ্ট বলছে কিছু বোঝবার জো নেই।'

এমন সময় জোরে জোরে কুঁকড়ো ডাকল—'আ-লা-হু-য়া !'

—'পাখিটা হালুয়া খেতে চেঁচাচ্ছে হে বিশ্বেস !'

—'আজ্ঞে না', বলে খুদিরাম ঘাড় নাড়লে। 'কুঁকড়োটা প্রথমে বললে—ধুপ উঠাহুঁ, রোদ উঠেছে। দাঁতন-কাঠিটা পড়তে বাচ্চা-ক-টা সেদিকে ছুটল দেখে বললে—ইষ্টক তিষ্ট। এখন বললে আকাশের দিকে দেখে—আলা হুয়া, আলো হয়েছে।'

খাতাঞ্চিমশায় বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে খুদিরামের দিকে চেয়ে বললেন—'আমার বিশ্বাস ছিল তুমি একটি—' মুখে এল—গাধা গরু, কিন্তু সামলে বললেন—'বানর।' খুদিরাম কাছাটা একহাতে কোমরে জড়ায়। খাতাঞ্চিমশায় গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বললেন—'এখন বুঝেছি তোমার পেটে শকুন-বিদ্যে আছে, সাধন করলে কালে স্ফুরণ পেতে পারে।'

ক্ষুদিরাম ভয়-স্তিমিত নেত্রে খাতাঞ্চিমশায়ের দিকে চেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে—'খাতাঞ্চিমশায়, সোনাতন দেশে গিয়ে অবধি সমানে খাটচি, খাতা ঝাড়চি, তল্পি বইচি, মুরগি রাঁধচি—আপনি শেষকালে এমন কথাটা বললেন—তোর পেটে শকুনি পড়েচে !'

—'কী আপদ ! বলি খুদিরাম, তুমি কুঁকড়োর কথা বুঝলে আর আমার কথাটার বেলায় উল্টা-বুঝলি-রাম করে ফেললে ! আমি

দেখতে পাচ্ছি তোমার পেটে পিলে-চাপা শকুন-বিদ্যে রয়েছে। জগতে এ বিদ্যে অতি কম লোকেই পায়। কুস্তুন্তনিয়ার এক সদাগর পেয়েছিল—সে গরু, গাধা, কুঁকড়ো আর কুকুর এই চার জানোয়ারের কথা বুঝত এবং বুঝত বলেই তার প্রাণরক্ষে হয়েছিল—তার আপন জরুর হাত থেকে। আর-একজন ফরাসী পণ্ডিতের শকুন-বিদ্যে আছে, তার নামটি ভুলেছি। এদেশে এক অবনীবাবুতে আর তোমাতে এই বিদ্যে অর্শেছে দেখছি। খবরদার, তুমি জানলে, আমি জানলেম —এ বিদ্যের কথা আর কাউকে জানতে দিও না—তোমার বিয়ে হয়নি তো?'

—'আজ্ঞে হয়েছে, অল্পদিন হল।'

—'বৌকে বলোনি তো এ বিদ্যের কথা?'

—'আমি নিজেই জানতেম না তো তাকে বলব!'

—'চেপে যেও, চেপে যেও কথাটা, নচেৎ সেই কুস্তুন্তনিয়ার সদাগরের মত ভোগ ভুগবে!'

—'আজ্ঞে আমার বৌ যে টিয়ে চন্দনা ময়নার কথা বোঝে আমারই মতো।'

—'আরে সে পড়া বুলি, শেখানো কথা সবাই বোঝে। এ হল স্বতন্ত্র, এক অদ্ভুত ক্ষমতার লক্ষণ! একালে এদেশে কোনো শর্মারই নেই এ বিদ্যে!'

খুদিরাম প্রশ্ন করলে—'রবিবাবুর?'

—'ওগো, রবিবাবু তো রবিবাবু, তাঁর ইস্কুল-মাস্টার জগদানন্দবাবু আমার ছিলেন বিশেষ পরিচিত—পোকা-মাকড়ের কথা পশুপক্ষীর কথা প্রভৃতি বইও ছাপিয়ে গেছেন, তাঁতেও এ বিদ্যের স্ফূর্তি দেখিনি!'

—'মহাত্মা গান্ধী?' বলেই খুদিরাম খাতাঞ্চিমশায়কে হুঁকো এগিয়ে দিলে।

—'ধান ভানতে শিবের গীত!' বলেই খাতাঞ্চি হুঁকো মুখে করলেন।

খুদিরাম মুচিবাড়ির দিকে চেয়ে বললে—'সত্যিই কর্তার কথায় ভয়ে আমার পেট কামড়িয়ে এসেছিল, যেন শুকুনি ঠোকর দিচ্ছে!'

—'ওর ওষুধ হচ্ছে তেল ফুলুরি কম করে খাওয়া। এসো তোমার বিদ্যের কতটা স্ফূরণ হয়েছে পরীক্ষা করি।—কী বলছে কুঁকড়ো এবারে?'

—'আজ্ঞে কুড়ুক মুরগিটাকে লাথি দিয়ে বললে—কোঁৎ!'

খাতাঞ্চিমশায় ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন—'ও কোঁতের মানে কী বিশ্বেস?'

খুদিরাম বললে—'ওঠ্!'

—'উঠলো মুরগি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, নিঃসাড়ে!'

—'তারপরে? বলে যাও।' বলেই খাতাঞ্চিমশায় আবার হুঁকো-মুখ হলেন।

খুদিরাম দেখে চলে আর বলে চলে—'একটা বেজি ঘাসবনে মুখ বাড়ালে। মুরগির ছানাগুলো—এ জী বেজী, জীব, জীব বলতেই মোরগ ধমকে উঠল—চোপ্পরহো। বেজি চট্ করে চম্পট দিলে।'

—'ভালো।' বলে খাতাঞ্চিমশায় ডান হাত থেকে হুঁকো বাঁ হাতে ধরে বললেন—'থেমো না, বলে যাও!'

গুড়ুক চলেছে ভুড়ুক ভুড়ুক। খুদিরাম বলে চলেছে—'মোরগ বলছে—

কুড়ুক কুক্কুটি! রউদ উঠি উঠি,
পিঁয়াজ গুটি গুটি, মিরিচ বুটি।
লাবক ছুটিরে কী দিলি নাস্তা,
বাদাম না পেস্তা—না ফুটি?'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'তারপরে বলে যাও

—'ফর্সা পাখিটা মশায় গান গাইছে যে!'

—'গেয়ে বল কী বলে।'

খুদিরাম গজল ধরল ভয়ে ভয়ে—

॥ গজল ॥

'শুন্। গুল্‌মুর্গী ফুল বনের বন মোরগ,
ফজিরে উঠি, খেলাই রুটি, পালক মুঠি চুজারে রোজ্-ব-রোজ্,—
না খেয়ে এক বুঁদ কি বুটি—খোদ্॥'

বাচ্চাগুলো ডেকে বলছে—'মিচি মিচি।'

—'চোপ্!' হাঁকলো মোরগ।

এবার সুর্মা মুরগিটা ছড়া কাটছে মশায়—

॥ আর্জি ॥

ঝুম্‌কা লতার সুর্মা বান্দির আর্জি হুজুর
ফজিরে উঠি, তদবিরে ছুটি
বিচুটি বন হতে অনেক দূর।
পোকা পাকাটি যা পাই খুঁটি
চুজারে খাওয়াই, চিংগানে খাওয়াই
গোবরের গাদায় চড়াই—
কাম কাজে বাঁদির নাই কসুর।
বেলাতক পড়ে না পেটে একবুদ্ চানাচুর॥

মোরগ ঝোঁট তুলে বলছে—

চাঁটগাঁই চিংগান
নাস্তা না পেয়ে হয়রান
খুঁড়চেন রাস্তা।
গন্ধুম না পেয়ে ধুম লাগাচ্ছেন
গুচ্ছার ধুল্ উড়াচ্ছেন
গুস্‌সায় চিল্লাচ্ছেন
হয়ে বেব্‌ভুল অবস্থা॥

গুল্ মুরগি বলছে—

হুজুর কইছেন না সাচ্ বাত্
পেট মোচড়াচ্ছে পিলে কেঁপে একটা সুঠোম হাত॥'

খাতাঞ্চিমশায়ের গলায় ধুঁয়ো গিয়ে কাসি শুরু হল—খক্ খক্। তিনিও যত কাসেন মোরগ মুরগিরা তত ডাকে—'ক্কক্ ক্কক্ কক্ ক—ক্—তফাৎ, তফাৎ।'

বিষম লেগে হেঁচে কেসে খাতাঞ্চিমশায় মিনিটখানেক পরে ঠাণ্ডা হয়ে বললেন—'ব্যাপারটা কী হল হে বিশ্বেস?'

—'একটা লড়ালড়ি হয়ে গেল কুঁকড়ো কুঁকড়িতে!'

—'সে-কথায় কাজ নেই, কী বলাবলি করলে সকলে তাই বল।'

খুদিরাম বললে—'মোরগ নয় তো, দেখলেম যেন একটা রং-বেরং গোলাপ গ্যাঁদার ঝাঁকা নেচে বেড়াচ্ছে মশায়।'

—'আহে, কী বলছে তাই কওনা!'

—'উদ্রু বলছে মশয়—মানে বুঝছিনে!'

—'মানে করে কাজ নেই, আউড়ে যাও যেমন শুনছ কানে।'

—'মোরগ বলছে—

নাস্তা খিলাও পাস্তা পিলাও জলদি
তোড়েঙ্গে হাড্ডি ফারেঙ্গে ফরুগল্॥

মুরগি কটা বলছে—

জেরা রহম কীজিয়ে,
বাজারমে না মিলি তণ্ডুল না চাবল।

মোরগটা বাঁদি কটাকে লাথাচ্ছে আর ককাচ্ছে—

কিয়া সব বরবাদ—উয়ো ভণ্ডুল

—মশায় বোঝা যাচ্ছে না, উদ্‌রুতে কী বলছে।'

—'আমি বুঝছি, তুমি আউড়ে চল না।'

—'ফরসা কুক্কুটী ভরসা ধরে মোরগের কাছে ঘেঁষে বলছে—

বাখুবি-কদম-বুসি, জেরা কান ধর্‌-কর্‌
শুনিয়ে বাৎ আক্কিল্‌ মন্দ্‌।
ফিরা ইস্তাবিল্‌ গোথানা, মিলি নেহি
একদানা দেল্‌ পছন্দ্‌॥
ঢুঁড় ঢুঁড় কর্‌ চৌরাস্তা, ফির আয়া ইহাঁপর খোদাবন্দ্‌
মোদিখানেকো আঁস্তাকুড় পর, মিল্‌ গেলে এক দানা—
আজবতর মোতি কে সে রং,
চাঁখ্‌ চাট্‌কর দেখা—না মটর কলাই, না ভুট্টা না গম।
নয়া চিজ্‌ একদম্‌।
লিজিয়ে সাহাব, দেখিয়ে ক্যা চিজ্‌, চাহে তো আপ খাইয়ে,
নেহি তো বাচ্চোঁকে খিলাইয়ে
ইস্‌ লিয়ে গার ম্যয় খায়া বেদম্‌॥

—'মোরগটা খেয়ে ফেললে নাকি দানাটা?'

—'কে জানে মশায়, দুচার বার ঠোঁট খুললে বন্ধ করলে। তারপর ছুট সবাই মিলে একদিকে—ককর কোঁ শব্দ দিয়ে।'

—'আরে ওইটের মানে কী তাই বল না।'

—'আমি কি উদ্‌রু জানি যে বলব! শব্দটা হল যেন—কঁকর কোঁ, হয়ত ঘানিঘরে তিল খেতে যাবার ইসারা করলে।'

—'তোমার যেমন বিদ্যে!' বলেই খাতাঞ্চিমশায় যেখানে মোরগ

ছিল—খুদিরামের হাত ধরে খালি পায়ে সেইখানে সেই মুচিবাড়ির বিচুটি ঝাড়ের কাছে এসে উপস্থিত।

—'ছ্যাখো তো কিছু হাতে ঠেকে কি না বিচুটিঝাড়ে হাত প্রবেশ করিয়ে।'

—'চুলকোবে যে হাত!'

—'ওহে ডান হাত চুলকোনো মানে লক্ষ্মীলাভ!'

খুদিরামকে বিচুটি হাতড়াতে দিয়ে খাতাঞ্চিমশায় শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে রাস্তার ধুলোয় মোরগের পায়ের দাগগুলোর উপর নিজের পা বুলোতে থাকলেন।

হঠাৎ চোখে ঠেকলো সাদা একটি দানা—টপ্ করে সেটি তুলে অমনি ট্যাঁকে গোঁজা।

—'পেলে কিছু হে বিশ্বেস?'

খুদিরাম বিচুটি-বন থেকে একটা বাওয়া ডিম টেনে বার করলে।

খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'খুদিরাম, দেখলে হে, বিশ্বের ফল হাতে-হাতে পেলে!'

—'আপনার তেজনজর আছে বলেই এটা পেলেম।—কিন্তু শেষ কথাটি কী বলে গেল মোরগটা তাই ভাবছি।'

—'ভাবো দেখি খুদিরাম!'

—'আমার সহজ বুদ্ধিতে তো বোধ হয়, কঁকর কোঁ বলে মোরগটা বললে—দানাটা কিছু নয়, কাঁকর ছোঃ।'

খাতাঞ্চিমশায় চমকে—'তা তো হতে পারে, কথাটা উর্দুও নয়, বাংলাও নয়, সমস্কৃত কঙ্করের অপভ্রংশ মত শোনাচ্ছে।'—বলে গোল পদার্থটা ট্যাঁক থেকে বার করে খুদিরামকে বললেন—'এটা কি কাঁকর? গোল যেন গজমোতির মত বোধ হচ্ছে না?'

খুদিরাম পদার্থটা উল্টেপাল্টে দেখে বললে—'কাঁকর হলে তো করকর করত।'

—'মা জগদম্বা, তোমার ছিষ্টিতে কত দ্রব্যই আছে!' বলে

খাতাঞ্চিমশায় পদার্থটা ট্যাঁকে গুঁজতে যান—খুদিরাম বললে—'একবার মুচি মিঞাকে দেখালে হয় না ?'

—'দেখাও।' বলে খাতাঞ্চিমশায় পদার্থটা সাবধানে মুঠোছাড়া করলেন।

মুচির হাতে সেটা পড়তেই সে বললে—'গবস্তির কাঁচা ফল—প্রায় পাকে না, তেলে পাকে শুনেছি। ভারি দামি চিজ !'

—'মা জগদম্বার কৃপা !' বলেই খাতাঞ্চিমশায় ফলটিকে নিয়ে চোঁচা মুদিখানা-মুখো। খুদিরাম বিচুটির জ্বালা সইতে সইতে পাছে-পাছে মুদিখানায় এসে দেখে, খাতাঞ্চিমশায় মুদির হিসেব চুকোচ্চেন। সামনে একশিশি তেল—তাতে গবস্তি ফলটি ডুবে আছে।

২

খুদ্দুর বস্তির পানা-পুকুরে কৌতুক ধোপা কাপড় ধুচ্ছে—খোদ্‌কস্তা খোদ্‌কস্তা খোদ্ খোদ্ পাইকস্তা ! গমের বস্তাকে বালিশ করে খুদিরাম দিবানিদ্রা দিচ্ছে আর স্বপন দেখছে তার হাতের পাঁচ কেবলি হয়ে যাচ্ছে ভেস্তা। লঙ্কাকাণ্ড শেষ করে আন্দো মুদি বেলা আড়াই পহর গতে গজকচ্ছপের যুদ্ধুর কথায় খড়কি গুঁজে কস্তা হাতে ঝাঁটাচ্ছে দোকানপাট, এমন সময় গজের মুখে বোড়েটি ঠেলে সংক্রান্তি ঠাকুর হাঁকলেন—'মাৎ !' এমো তক্তারপাটাতনখানা শব্দ দিলে, মচাৎ !

খাতাঞ্চিমশায়—'উস্ গরম ! তুমি বোধ করছ কেমন ?' বলে তালপাতার পাখাখানা দিয়ে নিজের পিঠ চুলকোতে থাকলেন।

হুঁকোটি খাতাঞ্চিমশায়কে এগিয়ে দিয়ে ঠাকুর বললেন—'আর বোধাবোধ, দেনা-পাওনা জীবন দিয়ে শোধ করার রকম।'

খাতাঞ্চিমশায় খালি ধুমা ছেড়ে বাঘা গোঁফ নিয়ে গজের দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে একটা হুঙ্কার দিলেন—'হুম্ !'

সংক্রান্তি ঠাকুর বললেন—'আর দাদা দেখ কি, মাৎ একদম !'

—'তোমার যদেব দেহ তদেব বচন,' বলেই খাতাঞ্চিমশায় নৌকো চেলে ঠাকুরের বোড়েটি ছকের 'পর থেকে চেটে তুলে নিয়ে হাঁকলেন —'খুদিরাম—'

সংক্রান্তি ঠাকুর নিজের হুঁকোটার খালি বৈঠকে হাত বুলিয়ে বললেন—'একটা কাজের কথা কইতেছেলাম—উদ্‌ভুট্টি চরের পঞ্চম অংশের দুই অংশ—'

—'সে বিষয়ে তো মুন্সেফ কোর্টে যবনিকাপাত হয়ে গেছে চুকিয়ে দিয়ে পঞ্চম অঙ্ক!'

সংক্রান্তি ঠাকুর মরিয়া হয়ে বললেন—'তামাসা নয় খাতাঞ্চিমশায়, আমি ব্রাহ্মণ পুরিৎ, পঞ্চম অংশের দুই অংশ ঠাকুরের প্রাপ্য আছে বেদের বিহিত।'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'তা তো বুঝলেম। কি হিত কি বিহিত মামলা করার আগে ভাবা ছিল উচিত।'

সংক্রান্তি ঠাকুর নরম হয়ে বললেন—'দোহাই, অনুচিত না করেন এমন!'

—'এখন ঘরে যাও, পুর্বসুখ করগা স্মরণ।' বলেই খাতাঞ্চিমশায় ডাক দিলেন—'খুদিরাম এলে?'

খুদিরাম পাশের ঘর থেকে সাড়া দিলে—'আজ্ঞা এলেম।'

সংক্রান্তি ঠাকুর নিশ্বাস ফেলে মুদিখানা ছাড়লেন—'মাগো দীনতারিণী তোমারই ইস্‌চে'—এই কথাটা যেন আউড়ে, খুলেই বন্ধ হল দোকানের ঝাঁপখানা।

খুদিরাম বিশ্বাস দেখা দিলেন, একটা শালপাতার ঠোঙা, এক গেলাস জল হাতে, মাথার একদিকের চুল গমের ভুষিতে সাদা।

খাতাঞ্চিমশায় ঠোঙাটা আর গেলাসটা খুদিরামের হাত থেকে নিয়ে বললেন—'যাও মাথাটা ঝেড়ে হাতে মুখে একটু জল দিয়ে এস, কাজের কথা আছে।'

খুদিরাম মাথা ঝাড়তে যায়, খাতাঞ্চিমশায় বলে উঠলেন—'না না

এখানে নয়, খাবারে ভুষি পড়বে।' খুদিরাম তফাতে আড়ালে গিয়ে ভিজে গামছায় হাতমুখ মুছে দুখান চিতি সুপুরি গালে ফেলে, ফিরে এসে দেখে খাতাঞ্চিমশায় জলখাবারগুলি শেষ করে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। খুদিরাম ঠোঙাটা গেলাসটা সরাতে যায় —খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'গেলাসটা থাক, ঠোঙাটা ঐ গরুটাকে দিতে হবে রাখো, বোসো কথা আছে'—বলেই স্তব্ধ কিছুক্ষণ।

খুদিরাম দেখলে বাইরে বাঁশের খোঁটায় বাঁধা হারানো গরু আর তারই পিঠে একটা ধোড়াকাকের দিকে চেয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাতাঞ্চিমশায়। সেই সময় কাকটা ভাঙা গলায় আওয়াজ দিলে— 'কা!' গরুটা গলা খাঁকানি দিয়ে তার জবাব দিলে।

খাতাঞ্চিমশায় বাঁ হাতে নিজের গোঁফজোড়ার জল মুছে বললেন —'আচ্ছা খুদিরাম, ঐ ধোড়াকাকটাতে খোঁড়া গরুটাতে কী কথা বলাবলি করছিল এতক্ষণ শুনেচো?'

—'আজ্ঞা হাঁ শুনেচি।'

—'আচ্ছা, বলে চল নির্ভয়ে।'

খুদিরাম বলে চলল—'কাকটা বললে—কা কা, গবস্তি বস্তিতে সুখটা কি? গরু জবাব করলে—ক্যান এহ্যানে সবই সুখ; নাস্তি কি? এঁটো শালপাতা আছে, তাতে খেঁসাড়ি ডালের সোয়াদ আছে, ভাতের ফেনটা আছে, আর আছে নাগালের কাছে খোড়ো চালে বিচিলি—নাই বা কি?'

খাতাঞ্চিমশায় ঝপ্ করে শালপাতার ঠোঙাটা গরুর মুখের কাছে ফেলে দিয়ে, গেলাসের জলে আঙুলের ডগাপাঁচটি ধুয়ে বললেন— 'শোনো তো খুদিরাম এবারে কি বলাবলি হয়!'—বলেই অর্ধনিমীলিত-নেত্র খাতাঞ্চিমশায় তাকিয়া ঠেসান।

খুদিরাম বললে—'বলা-কওয়া নেই খালি ঠোঙাটা নিয়ে পালাবার চেষ্টা কাকটার। গরুটা সেটা টেনে নিয়ে চিবিয়ে বললে—'

—'বলে ফেল কী বললে—'

—'আজ্ঞে কথা তো কইচে না, মচর-মচর পাতা চিবোয় আর ন্যাজ তুলোয়—'

—'তারপর ?'

খুদিরাম বললে—'তারপরে "মা" বলে খোঁটার গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল গরুটা। কাকটা কানটাতে টান দিতে গরুটা মুখ ফিরিয়ে শিং নেড়ে পাল্টা শুলো পিঠের 'পরে ন্যাজটা ফেলে।'

—'কাকটা কি বললে খুদিরাম ?'

—'আজ্ঞা কাকটা গরুর ন্যাজটাতে টান দিয়ে,—আকা আকা শব্দ করে উড়ান দিলে,—এখনো যাচ্ছে দেখেন।'

খাতাঞ্চিমশায় চাঙা হয়ে উঠে বললেন—'কই কই, কোন্ দিকে ? কবার ?'

খুদিরাম অবাক। খুদিরামকে ধমক দিয়ে খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'আহা, কোন্ দিকে কী বলে ডাকলে কাকটা কবার তাই বলনা !'

—'আজ্ঞে গরুটার পাছের দিকে দুবার ডাকলে—আকা আকা, তারপরেই লম্বা—এখনো উড়ে চলেছে দেখেন।'

খাতাঞ্চিমশায় কাকের দিকে না দেখে, ঝাঁপের বাইরে আকাশে চোখ বুলিয়ে বললেন—'দ্বাবিংশতি দণ্ড হবে, গরুর ন্যাজটা কোন্ দিকে আছে দেখ তো বিশ্বেস।'

খুদিরাম মাথা চুলকে বললে—'আজ্ঞে ঠিক বলতে পারলাম না, এই আমি এদিকে আপনি ওদিকে এইভাবে ন্যাজটা আর কাকটা ছিল।'

—'অ্যাঃ তোমার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হল না এখনো। নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট না হলে সর্বে আমিনি তো চলবে না তোমার দ্বারা।'

খুদিরাম মরিয়া হয়ে কপাল ঠুকে বললেন—আজ্ঞে যাবার বেলা কাকটা বলছিল—ইষ্ট ইষ্ট।'

—'তাই বল,' বলে খাতাঞ্চিমশায় আওড়ালেন—'দ্বাবিংশতি দণ্ডে পুবেতে কাক রটে আকা আকা—আপ্ত কলহে জয়লাভ বাপা।'

এই বলে খাতাঞ্চিমশায় কিছুকালের জন্য ধ্যানস্থ। খুদিরাম দেখছে, ঝাঁটা গোঁফ আর চওড়া ভুরুতে মিলে উপর-নিচে, এপাশ-ওপাশ যেন টাগোয়ার খেলছে। এমন সময় একটা চির্‌র্ শব্দ আকাশে।

—'ওটা কী পাখি ডাকলে খুদিরাম, চিল নাকি ?'

—'আজ্ঞে না পাঠশালার ছেলেরা চেংঘুড়ি উড়িয়েছে।'

—'পাঠশালার গুরু কে হল ?'

—আজ্ঞে এখনো ডিস্টিক্‌বোর্ট্ ছেঙ্‌সন্ করেনি, সংক্রান্তি ঠাকুরই পড়াচ্ছেন।'

খাতাঞ্চিমশায়ের চশমা ভ্রূকুটি বেয়ে নেমে বসল তাঁর নাকের দাঁড়ে—ডানা-মেলানো যেন একটা পতঙ্গ-বিশেষ। তারপর বাক্স খুলে একফর্দ সাদা কাগজ টেনে বার করে খুদিরামকে বললেন—খুদিরাম, তোমাকে ঐ পাঠশালার গুরুগিরির জন্যে দরখাস্ত লেখা চাই। নাও কাগজ কলম।'

খুদিরাম আপত্তি তুললে—'আজ্ঞে ব্রাহ্মণের অন্ন—'

—'বিদ্যে নিয়ে বিচার, জাত নিয়ে বিচার এখানে নয়। তোমার পেটে বিদ্যে আছে—নাও লেখ।' বলেই খাতাঞ্চিমশায় বলে চললেন ইংরিজিতে গড়গড়—'ডিরেকটার পাবলিক ইন্‌টক্‌সান ইত্যাদি বরাহ-বরেষু।' লেখাটা বার হতে থাকলো খুদিরামের কলমে ঐ ভাবে বাংলাতে চর্চড়।

দরখাস্ত শেষ হলে খাতাঞ্চিমশায় সেটা বাক্সে বন্ধ করে খুদিরামকে বললেন—'একটা নৌকো ঠিক রাখা চাই, উদভুট্টি চরে ভোরেই খোঁটাগাড়ি করতে যাবো।' বলেই বৈকালিক নিদ্রার আবেশে চক্ষু বুজোলেন খাতাঞ্চিমশায়। খুদিরামও ছুটি পেলে সেদিনের মতো।

* * * *

উদভুট্টির চরটায় শিল আর বৃষ্টি, ঝিল্লি ফুকরায়—একি অনাসৃষ্টি ! দাঁড়কাক ডানা ভারি, খাড়া ভেজে ভাঙা ডালে। বাঁশপাতার শীত

পায় বস্তির একধারে। কাদাখোঁচা কাদা জলে চলে পা টিপ্‌টি টিপ্‌টি। খুদিরাম নৌকোর ছাতে ত্নু-পুরু চটের ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে—খাতাঞ্চিমশায় নৌকোর মধ্যে ছিটের বালাপোষে অদৃশ্যপ্রায়।

খাতাঞ্চিমশায় বলছেন ছইয়ের ভিতর থেকে, খুদিরাম জবাব দিচ্ছে ছইখানার উপর থেকে।

—'খুদিরাম!'

—'আজ্ঞে!'

—'কোন্ দিকে হাওয়া বইছে?'

—'আজ্ঞে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

—'কিনারায় ধরাও নৌকো, দিক নির্ণয় করা আবশ্যক।'

—'আজ্ঞে চতুর্দিকে জল, থল তো দৃষ্টিগোচর হয় না, লৌকো ধরাই কোথা?'

ছইয়েব মধ্যে থেকে ভারি গলায় হুকুম এলো—'থলে আবার লঙ্গর ফেলায় কে? জলে ফেলাও।'

ছইয়ের উপরে গুজগুজ চললো খানিক—'ও চাচা মাঝ-দরিয়ায় লঙ্গর করতে বলে, কি উপায়?'

—'আহে দড়া বাধি একখানা তক্তা তো জলে ফেলাও, বুঝি জলের গতি, ত্যাহাই যাক কী হয়।'

ঝপাং করে দড়া-বাঁধা তক্তা জলে পড়ে, তিনবার ঘুরপাক খেয়ে কাঁটা-গাঁথা কুমিরের মত মারলে ডুব। দড়াতে কড়-কড় টান পড়লো, তারপর নৌকো দেড় পাক ঘুরে তিন হাত আগে একটা জলে-ডোবা বাবলা ঝাড়ে চড়ে বসলো। খাতাঞ্চিমশায় পিঠের দিক থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে আবার সোজা হয়ে বসে বললেন—'ধরলো কিসে?'

এবারে মাঝি বললে—'আজ্ঞে ইসে!'

নৌকো স্থির হতে খাতাঞ্চিমশায় ছইয়ের মধ্যে থেকে কাছিমের মত মুখ বার করে বললেন চারিদিক দেখে—'খুদিরাম, এ যে গাছে

চড়িয়ে দিলে! তলার জল নেমে গেলে যে পপাত হবো—ডানা তো নাই কাকপক্ষীর মত!'

করিম মাঝি সাহস দিয়ে বললে—'ডালি বেয়ে নেমে পড়বেন কর্তা।'

খাতাঞ্চিমশায় করিমকে শুধোলেন—'এভাবে ঝুলে থাকতে হবে কতক্ষণ?'

—'বড়জোর আজ রাতটা। কাল খোঁটাগাড়ি করতে চরে উৎরোবেন।'

—'আর উৎরে কাজ নেই, সাঁৎরে না ঘরে যেতে হয়!' বলেই ডাকলেন—'খুদিরাম!'

খুদিরাম একটা লণ্ঠন হাতে ছইয়ের মধ্যে ঢুকতেই খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'খুদিরাম কপালটা যেন গরম গরম বোধ করছি—দেখ তো!'

—'তাই তো, এ যে স্পষ্ট জ্বর!'

—'দাও তো একটু গরম চা।'

খাতাঞ্চিমশায় চা খেয়ে একটু সুস্থ হলে খুদিরাম বললে—'এ স্থান ভালো নয়; এখানে গোর আছে শুনেছি। আর খোঁটাগাড়িতে কাজ নেই এ শ্মশানে। সংক্রান্তি ঠাকুর বলছিলেন, এখানে তাঁর পূর্ব-পুরুষের কে দণ্ডি হয়েছিল—তারই সমাধি আছে।'

ভূতের ভয়ে খাতাঞ্চি টলে না। 'তোমার মতো বালক তো দেখিনি!' বলে খাতাঞ্চি বাইরে এসে মাঝিকে বললেন—'দাও একটা বাঁশ, দেখি কত জল?' বলেই একটা লগা নিয়ে জলের মধ্যে সজোরে গেঁথে দিলেন। বাঁশ টেনে তোলে কার সাধ্য! খোঁচা পেয়ে একটা কাৎলা মাছ ডিগবাজি খেয়ে নৌকোয় পড়লো।

খুদিরাম মাছটা চেপে ধরলে।

করিম একগাল হেসে বললে—'কর্তা যা খোঁটাগাড়ি করেছেন নড়ায় কার সাধ্য, একটা ফেলাগ হলে হত!

খাতাঞ্চিমশায় খুদিরামের লাল গামছা বেঁধে দিয়ে বললেন—'খুদিরাম, উদ্‌ভুট্টি চরে তোমাকে আমি নায়েব করলুম। কাল হুকুম লিখে দেবো—'

কাল যখন এলো তখন খুদিরাম—কালাজ্বরে অঘোর খাতাঞ্চি-মশায়কে নিয়ে তুপুলিয়ার কাছারিবাড়ির ঘাটে নৌকো লাগালো।

রতনমালার বিয়ে

—'আরে এস এস অবুবাবু, গল্প শুনবে। কিছু এনেছ নাকি?'

—'না চাঁইদাদা, আজ কিছুই পাইনি,—লেবুর লজেঞ্জুস আছে।'

—'ও আমার চলে না, তুমি রাখো।—হাই উঠব-উঠব হলে একটা গালে ফেলো। হাঁ, তারপর বলছিলেম কি, চার ভাই—উত্তর ডিহি, দক্ষিণ ডিহি, পুব ডিহি, পশ্চিম ডিহি—চার ডিহির মালিক। রাজা বললেও হয়। সুখে বসবাস করচেন, আপ্তকুটুম, দাস-দাসী, লোকলস্কর ঢের। কেয়াতলার কালিবাড়ি, তারই কাছে মস্ত বসতবাড়ি।—সদর বাড়ি, অন্দর বাড়ি, রান্নাবাড়ি, পুজোবাড়ি, এমনি অনেকগুলো ছোটবড় বাড়িঘর নিয়ে একটা সাতমহলা ব্যাপার যাকে বলে—বুঝেছো?'

—'বুঝেছি, মাসিমার জয়নগরের বাড়ির মতো।'

—'আরে না গো, জয়নগরের বাড়ি বড়ো বড়ো ইঁট দিয়ে গাঁথা, সাহেবমিস্ত্রির তোলা ইমারত; আর সে সাতমহলা বাড়ি পাঁচ ইঞ্চি ইঁটের আর কাদার গাঁথুনি—পুরু পুরু দেওয়াল, শাবল মারলে শাবল তুমড়ে যায়, একখানি ইঁট খসে না—বুঝলে?'

—'সে-বাড়ি এখনো আছে?'

—'তা কখনো থাকে? শাবল মারলে ভাঙেনা সে বাড়ি! কালের কবলে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে ইষ্টকস্তূপে পরিণত হয়েছে, ঝুড়ি-ঝুড়ি সেই ইঁট কুড়িয়ে কত লোক নতুন দেওয়াল তুলে বসে গেছে ঘরবাড়ি ফেঁদে, বড়মানুষি করছে—একেই বলে ভাই—যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই!'

—'আচ্ছা চাঁইদাদা, সেই চার ভাই—তাদের আপনার জন কি কেউ বেঁচে নেই এখন ?'

—'কেন থাকবে না—এই আমি আছি বসে জলজ্যান্ত, আর সুন্দরবনের রায়-বাঘিনীর জুড়ি তোমার চাংড়াদিদি—তিনি হাঁক পাড়ছেন শোনো রান্নাঘরের পিছনে, খিড়কি-পুকুরের ঘাটের কাছে। —ছোট দু-ভায়ের আমরা দুটি আছি।'

—'বড়ো দু-ভায়ের কেউ কোথাও কি আছে ?'

—'আছে শুনেছি, একজন দুজন।—ইস্ফাহানে, ইস্তামবুলে, ইজিপ্টে ইজিচেয়ারে বসে হাবোল-বাবোল টানতে আর ধুমা ছাড়তে আরবীপাসার উজির নাজির হয়ে, কেউ বা আছে কাবুলিওয়ালার বেশ ধরে, বোগদাদ বসোরাতে বেদানা আঙুর ফেরি করতে। ভোল ফিরে গেছে, তাদের চেনাই যায় না আমাদের কেউ বলে। বোলও তাদের অন্যরকম। তারা রবাব বাজিয়ে গান গেয়ে দিনে মেওয়া বেচে, রাতে সিন্ধবাদ জাহাজীর মজলিশে বসে আওড়ায়—'আলফ্ লয়লা ওয়া লয়লা !'

—'তোমার সঙ্গে তাদের কারুর দেখা হয়না চাঁইদাদা ?'

—'কেন হবে দাদা ? যদি তাদের কাছে ধার করে গায়ের ধোসা কিনতেম তবেই দেখা হত।'

—'কেন।'

—'ওর মধ্যে কিন্তু নেই দাদা। ধারে শাল নিলেই এসে যায় তারা। লাঠি হাতে দুয়ারে এসে হাঁক দেবে—পেসৌর সে আতা হুঁ —অমনি ঘরবাড়ি ফেলে দে-দৌড় করতে পারে তো বেঁচে গেল সে-বছরের মত বেচারা !'

—নাহলে ?'

—'নাহলেই কলম্বানেবু শুঙিয়ে জাতটি খুইয়ে দিয়ে চলে যাবে সে। তাতেই তোমার চাংড়াদিদি কলম্বানেবুর উপর চটা।'

—'চাংড়াদিদির কথা ছেড়ে দাও, তারপর কী হল বল।'

—'বলি ভাই। এক শকুনের মামলায় ভুচুরের পিসি মাসি—এ হল চানাচুরওয়ালী ও বন্‌লা বোষ্টমী। আর এক কলম্বানেবুর মামলায় আর-এক উৎপাত বাধল ও তোমার চাংড়াদিদির দিদিমার দিদিমা তার দিদিমারও দিদিমার বিয়েতে।

—রায়দিঘির ছোট রায়কে রায়গিন্নি ডেকে বললেন,—ওগো, ছোট্-ঠাকুরঝির বিয়ে দেবার কী করছ! বয়সটা যে পেরিয়ে যায়!

ছোট রায় সুখ রায় নিজের টাক মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,—কী করি বল—নিরুপায়।

রতনমালার বিয়ে হওয়া দায়! কলম্বানেবুর গন্ধের জ্বালায় দুই ভাই দেশছাড়া হয়েছে। রতনমালাটাও বুঝি যায়! পীরের সিন্নি দিলে যদি রক্ষা পায় এ যাত্রা।

গিন্নিঠাকরুন বললেন—ওমা সে কী কথা গো!

—কেন, গোটাকতক সিকির ওয়াস্তা—এসে যাবে ছেলে, এত ভাবো কেন।

—মলেও সে হবে না আমার দ্বারায় তাতে বিয়ে হোক আর নাই হোক।

—বুঝছো না গো, বুঝছো না! তোমার মেয়েটাও যে বিয়ের যুগ্‌গি হয়ে উঠল।

—পরের কথা পরে ভাবা যাবে—বলে রায়গিন্নি পান গালে ফেলে চলে যান চানে। রায়মশায় পীরের মানত করেন মনে মনে।

এমনি চলছে। এমন সময় এক সন্ধেকালে কেয়াতলার কালী-বাড়ির আরতি চুকে নিশুতি হয়-হয়, ঠিক সেই কালে রায়মশায়ের দোরে এক ফুটফুটে ছোকরা এসে হাজির।

—কে হে বাপু তুমি? কনে হতে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে আমি পড়ুয়া ব্রাহ্মণের ছেলে। ও-গাঁয়ে টোল আছে,

পড়তে চলেছি। পথে আসতে হয়ে গেছে রাত। কোথা যাই এখন!

—ভালো কথা। আজ রাতটা এখানেই কাটাও, কাল তখন যাবা টোলে। এই বলে ছোট রায় ছেলেটিকে বাসায় রেখে গিন্নিকে ডেকে বললেন—গিন্নি, পাথরে পাঁচ কিল. ছেলে এসে গেছে মনের মতো! তারপর গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ চললো কর্তাতে গিন্নিতে আধরাত পর্যন্ত। চাকরানীমহলে রটলো কথাটা—ছেলে কেমন, উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখাও হল।'

—'তারপর কি হল চাঁইদাদা?'

—'যা হয়ে থাকে ভাই। সে রাত তো কাটল, তার পরদিন সকালে উঠে ছেলে পড়তে যেতে চায় ভুগিলহাটে গুরুর টোলে—দোর খোলা পায় না, একটি কে এসে খিড়কিঘাটে বাসন মাজছে। —হ্যাঁগা খিড়কি দোরটা খুলে দাও আমি যাই!

—তাও কি হয় গা, হাত মুখ ধোও, মিষ্টিমুখ করো। যেমন এলে তেমনি কি যেতে আছে!

মিষ্টিমুখ করতে রয়ে গেলো ছেলেটি তো রয়েই গেলো—আর যাওয়া হল না ভুগিলহাটে টোলের পড়া নিতে। ভুগিলহাটের গুরু-মশাই গুনে দেখেন তাঁর সেই একটি ছাত্র খালি পড়ে রোজই। আর পোড়োদের গুরু শুধান—হ্যাঁরা, মুখুটির পোলা গেল কনে? দেখি না যে টোলে!

মুখুটির সন্ধান করে করে গুরুমশাই হয়রান। ওদিকে বেজে উঠেছে ঢাক-ঢোল—রতনমালার বিয়ে।

—বাস!—বলে গুরুমশাই মাথায় ফেটা বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত সুখ রায়ের বৈঠকে।

—আসুন, আসুন, প্রণাম! মুখ কিছু মলিন দেখচি যে?

—আর বলেন কেন, অমন ছাত্রটিকে রায়-বাঘে নিলে!

—কী পরিতাপ! রায়মশার বাঘা গোঁফ ঢাকা চাপা হাসি।

গুরুমশায়কে যেন অভয় দিয়ে থাবা বাড়িয়ে একটুকরো কাগজ তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে জানালেন যে গুরুদক্ষিণা এই পাঁচখাদ জমি।— পরিতাপ করবেন না বালকটির জন্যে!'

—'সে ছেলের মা-বাপ কি করলে?'

—'সে জানে তোমার চাংড়াদিদি, আমি ওদের কুলের খবর রাখি না। কাল একটা কলম্বা আনো তো আর-একটা গল্প বলব।'

চৈতন চুটকি

বাস্তুভিটে যাকে বলি। সে কী আশ্চর্য কারখানা! পাখির ডিমের উপরের খোলার মতো পাতলা, হাজার হাজার বছরের পুরোনো চিনেমাটির তার দেওয়াল,—এমন হালকা এমন ঠুন্‌কো হয়ে গেছে যে, শব্দের রেশ, বাতাসের পরশ পেলে কাঁপতে থাকে,—মনে হয় এখনি বুঝি ফেটে চৌচির হল। এই ঠুন্‌কো পাতলা চিনেমাটির আশ্চর্য বাড়ি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। এর মধ্যে হুজুরের চাকর-বাকর যারা কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে তারা আস্তে উঠছে, আস্তে বসছে, আস্তে চলছে, আস্তে বলছে—হুজুরের ভয়ে যত না হোক, পাছে কিছু তারা ভাঙে, পাছে তাদের সেই পুরোনো ঠুন্‌কো দেওয়ালের কোথাও আঁচড় লাগে সেই ভয়েই তারা সর্বদা সাবধানে আছে। শুনেছি এক সময় একজন নতুন চাকর অসাবধানে হঠাৎ চিনের পুতুলের একটু চটা উঠিয়ে ফেলেছিল। যখন তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালবার হুকুম হল তখন সে বললে—'অপমানের জন্যে দুঃখু করিনে; অমন পুতুলটি খণ্ডিত হয়ে গেল আমারই হাতে!' প্রাণের চেয়ে পুতুলই ছিল তাদের বড়।

এই বাড়ির বাগান—আরো আশ্চর্য! কত বড় যে সে বাগান-খানা তা সে বাগানের সর্দার-মালীও বলতে পারে না। কুঞ্জবন সে গিয়ে মিলেছে মহাবনে, মহাবন সে মহাসমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত নেমে গেছে—ছাওয়ার মত হয়ে। এখানে এক-একটি যত্নের গাছে যখন ফুল ধরে, ফল ফলে, তখন তাদের বোঁটায় মালীরা সোনার আর রুপোর ঘুঙুর বেঁধে দেয়; বাতাসে সেগুলি বাজতে থাকে, তবে জানা

যায় বাগানে অমুক দিকে ফুল ফুটেছে, অমুক দিকে ফল ফলেছে—এত বড় সে বাগান, এমন চমৎকার এমন সৌখীন বাগান।

এই বাগানের একটি দিক—সেদিকের খবর না-জানেন হুজুর, না-জানে তাঁর মালী ; কেবল জানে দেশের যত লক্ষ্মীছাড়া আর তাদের রানী—সে একটি কচি মেয়ে—নীচ জাত। কেউ তাদের চায় না, তাই কেউ যেদিকে যায় না সেইদিকে তারা একলা আছে—একটি প্রকাণ্ড কল্পতরু হেলে পড়ে সমুদ্রের নীল জলের উপরে ছাওয়া দিয়েছে—তারই তলায়। ছোট জাত, কাজেই রাজবাড়ির সাত তলার একটি তলাতেও তাদের জন্যে জায়গা নেই। দেশের লোকের পায়ের ধুলো-কাদা ধুয়ে নেবার জন্যে রাজার দেউড়িতে দু'বেলা হাজির থাকবার হুকুমটাও না ;—যদিও দেশশুদ্ধ সবাইকে তারাই কিন্তু বরাবর বছরে বছরে নিয়মিত বাগানের খাঁটি পদ্মমধু জুগিয়ে আসছে।

এই যে কল্পতরু যার পাতা কখনো খসে না ফুল কখনো ঝরে না, এরই উপরে একটি পাখি। সে যে কী পাখি, কেমন পাখি তা তো বলা যায় না—কিন্তু তার গান—সে যে স্বর্গের কিন্নরীদের গানের চেয়ে মিষ্টি। সমুদ্রের এপারে গাইছে সে পাখি, সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত তার সুর গিয়ে ঠেকছে—চাঁদনি রাতের আলোর মত বাতাসের ঢেউয়ের উপর দিয়ে। মাঝি মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ থামিয়ে সে গান শুনে গেল, ওপারের লোক সমুদ্রের ধারে দিনের পর দিন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে সে গান শুনে মশগুল হয়ে রইল, আর সে গানের কত তারিফ করে তারা বই লিখলে, বর্ণনা দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলে সেই চমৎকার আশ্চর্য পাখির কথা ; অথচ সেই ছোট মেয়েটি আর তার দলের লোক ছাড়া বাগানের মালিক যিনি তিনিও জানেন না, বাগানের মালী যারা তারাও জানে না, হুজুরের সভাসদ পরিষদ লোক-লস্কর পরিবার প্রজা কেউ জানে না এই আশ্চর্য পাখির খবর—যার গানের কাছে সেই চমৎকার বাড়িখানা, সেই অদ্ভুত বাড়িখানা; সেই অদ্ভুত বাগানটিও কিছুই নয়।

চট দিয়ে মোড়া গালামোহর-করা একরাশ বই আজ অনেক দিন হল বিদেশ থেকে হুজুরের তাকিয়ার কাছেই পড়ে আছে—সময় নেই যে তিনি সেগুলো খুলে দেখেন। সেদিন বেলা দুপুরে একটা মশা হঠাৎ কানের কাছে হুল ফুটিয়ে হুজুরের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই অথচ মশাটা বারে বারে ঘুমও ছুটিয়ে দিচ্ছে। হুজুর হাতের কাছের সেই চট-মোড়া বইগুলো একে-একে খুলে দেখতে লাগলেন। বইগুলো তাঁর ঠুন্‌কো বাড়ির কারখানা, অদ্ভুত বাগানের বর্ণনায় ভরা। এর মধ্যে একখানা বই—তার মলাটের ছবিটায় তাঁর চোখ পড়ল—সোনার একটি ফুলের ডালে পাখি গাইছে। হুজুর সেই বইখানা খুলে পড়তে লাগলেন—'হুজুরের আশ্চর্য পাখির গান।' যিনি প্রকাশক তিনি বিদেশের একজন বিখ্যাত ওস্তাদ। বইখানা পড়তে পড়তে নাকের উপরে কচ্ছপের খোলা দিয়ে বাঁধানো মোতিয়াবিন্দু চশমার বড় বড় গোল দুখানা পরকলার ভিতর দিয়ে হুজুরের দুই চোখ বিস্ময়ে ক্রমে বড় হয়ে উঠছে বেশ দেখা গেল। বাড়ির প্রধান কর্মচারী যিনি কাজের খবরের চেয়ে হুজুরের মেজাজ কখন কেমন তারই খবর ভালো করে রাখেন, তিনি আজ পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছিলেন। কর্তার চোখ যতই খুলতে দেখা গেল—কর্মচারীর দম ততই বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আজ কর্তা অনেকটা চোখ খুলেছেন; না-জানি আজ কপালে কী আছে এই ভাবতে ভাবতে তত্ত্বাবধানিক যখন তিনশো-তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম জপছিলেন এবং দশ আঙুলে কচ্ছপ-মুদ্রা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কর্তার নাকের উপরে কচ্ছপের খোলায় বাঁধানো চশমাটিকে শাপ দিচ্ছিলেন যেন ওর কাঁচদুখানা এখনই গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়—এমন সময় সত্যিই চশমাখানা খুলে কর্তা ডাক দিলেন—'কোই হ্যায়!' কচ্ছপমুদ্রা দেখাতেই হুজুরের চশমা চোখের উপর থেকে সরে গেল, কর্মচারী নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন! তিনশো-তেত্রিশ কোটিকে একে-একে প্রণাম করবার তাঁর সময় হল না, তিনি দরজার চৌকাটে তিনবার মাথা ঠুকেই খালি পায়ে কর্তার

সামনে উপস্থিত হলেন। তখন কর্তার চোখ আবার বারো-আনা বন্ধ হয়ে এসেছিল। তিনি বললেন—'এই বইখানাতে আমার এ বাগানের একটি পাখির কথা লিখছে, বলছে—আমাদের যত কিছু অদ্ভুত আসবাব আছে সেগুলো কিছুই নয় এই আশ্চর্য পাখির গানের কাছে।—এ পাখির খবর কিছু রাখ?'

তত্ত্বাবধানিক দেখলেন হুজুরের চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ হতে আর লহমা-দুই বাকি; তখন তিনি সেই সময়টুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে রয়ে-বসে জবাব দিচ্ছেন—'হে প্রবল-প্রতাপ! ভবদীয় দাসানুদাসের নিবেদন এই যে -মহারাজ রাজ্যের সংবাদ ও খবর অর্থাৎ যে খবর যথার্থ খবর—খবরের মত খবর, তা এ দাসের অবিদিত নাই। আজ্ঞাধীন সকল খবরই রাখে মহারাজ, কিন্তু এই কাল্পনিক পাখি, এর গানের ইতিহাস পুস্তক-প্রণেতার কল্পনা—যাকে পণ্ডিতেরা বলেন কবি-কল্পনা—সু-ত-রাং—!'

হুজুরের চোখ তখন পূর্ণ বন্ধ হয়েছে; তিনি বললেন—'হুঁঃ কল্পনাই ব-টে—' তারপর আর তাঁর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পাখির খবরের দায় থেকে উদ্ধার হয়ে কর্মচারী পায়ে পায়ে সরে পড়েন, এমন সময় সেই দুষ্টু মশা আর-একবার হুজুরের কানে পোঁ করে ভেঁপু বাজিয়েছে। মন্ত্রী প্রায় দরজা পার হয়েছিলেন, কর্তার নিদ্রাভঙ্গ হতেই তিনি দুয়োরের গোড়ায় পাপোঁছখানার উপরেই ঝপ্ করে বসে পড়েছেন। কর্তা আর-একবার চশমা এঁটে কর্মচারীর দিকে ফিরে বললেন—'সব কথাই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও! বিদেশের কেতাবে যখন এ পাখির কথা উঠেছে তখন এটা মিথ্যে হতে পারে না; আমি জানি তারা কাজের মানুষ, আবোল-তাবোল বাজে বকা তাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি। এই পাখির গান আমার না শুনলেই নয়। আজ সন্ধ্যার সময় তাকে আমার মজলিসে হাজির করবে, আমার গানের ওস্তাদ সবাইকেও নিমন্ত্রণ করবে—যাও।'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিচ্ছে, তত্ত্বাবধানিক ভাবতে ভাবতে চলেছেন, কেমন করে পাখির সন্ধান করি ? দেশের কেউ যার খবর জানে না তাকে ধরা তো সহজ নয় ! এমন সময় হুজুর বললেন—'আমার এ ঘরে মশার উৎপাত হয়েছে। আচার্যিদের দিয়ে মশা হবার কারণটার তদন্ত অবিলম্বে করবে—পাঁজিতে এ-বৎসর সকল প্রকার মক্ষিকার কোঠায় শূন্য দেখছি অথচ মশার জ্বালায় নিদ্রা হচ্ছে না এরই বা অর্থ কী !'

কর্তার চোখ খোলবার মূলে এই মশা। এই মশা-বংশ নির্মূল না হলে রক্ষা নেই এটি বেশ করে আচার্যিদের সমঝে দিয়ে প্রধান কর্মচারী সদ্দার-মালীকে পাখির সন্ধানে পাঠালেন। আজ এই দুটো বড় বড় কাজ সারতে তাঁর নাওয়া-খাওয়া হতে বেলা দুটো বাজলো। ইতিমধ্যে কর্তার খানসামা তিনবার জেনে গেছে পাখি এল কি না।

তত্ত্বাবধানিক অতি গম্ভীর লোক। সকলের চেয়ে তিনি কম কথা বলেন, কম চলা চলেন। পাখি যে কী জানোয়ার এবং মশা যে কী পাখি এটা তাঁর জানবার কোনদিন প্রয়োজনও হয়নি, সুবিধাও ছিল না,—কাজের চিন্তায় তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়। লোকের দশটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ-পর্যন্ত মাত্র একটি 'চুট্'—তাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার উচ্চারণ না করেই—বলে এসেছেন, আর তাঁকে আজ কর্তার প্রত্যেক প্রশ্নের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্তর দিতে হচ্ছে। এদিকে মালী এসে জানালে পাখির কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। এইসব উৎপাতে হয়রান হয়ে কর্মচারী যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন এবং পাখি না হাজির করতে পারলে মাথা কাটা যাবে একথা চুপি-চুপি জানিয়ে উকিল ডেকে বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করে একটি উইল লেখবার উদ্যোগ করছেন তখন তাঁর উকিল একটু মাথা চুলকে বললেন—'বলতে সাহস হয় না—একবার মজলিসি লোকদের নামের লিস্টিখানা উল্টেপাল্টে দেখলে হত নি ! যদি পাখি বলে কোনো

কেউ হুজুরে কোনো কালে নিমন্ত্রণ-পত্রের জন্য সওগাদ দিয়ে থাকে তবে সহজেই তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যাবে।'

উকিলের কথামত দপ্তরখানার নামের তালিকা ঘেঁটে দেখা গেল, তাতে 'পা'এর কোঠায় ও 'প'য়ের কোঠায় অনেকগুলো পা ও পদবী-ওয়ালা নাম, কিন্তু 'পাখি' কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর দেশের সভাসমিতি কমিটি জমিটি এ-সভা ও-সভা এ-সমাজ ও-সমাজের বাৎসরিক রিপোর্টগুলো আনিয়ে কর্মচারী দেখলেন সেখানেও পাখির নামগন্ধ নেই। দেশের গণ্যমান্য বুধ-বৃহস্পতির সভার সদস্যমণ্ডলী বলে পাঠালেন—'তাঁদের কমিটির একখানি কীটদষ্ট প্রাচীন রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে যে, কর্মচারী যাঁর সন্ধান করচেন তাঁকে এই সভা থেকে একবার একটি সম্বর্ধনা ও রুপার তাম্রশাসন ও স্বর্ণলেখনী মায় মস্যাধার দেবার প্রস্তাব উঠেছিল এবং বাৎসরিক হিসাব-নিকাশে সভা তার একটা চুম্বকও পাচ্ছেন কিন্তু উক্ত রিপোর্টের সন তারিখ ইত্যাদি এমনভাবে কীটদষ্ট হয়েছে যে তার চিহ্নমাত্রও পাওয়া দুষ্কর! হুজুরের তহবিল থেকে কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য হলে কীট-ভাষা-তত্ত্ববিদ-গণের দ্বারায় এই পুঁথির মাসপঞ্জী ইত্যাদি অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, অন্তত উক্ত পুঁথির জন্য একখান খেরুয়া বস্ত্র পেলেও আপাতত তাঁরা হুজুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুখী করতে পারেন।'

কর্মচারী আশা করেছিলেন দেশের সব সভা-সমিতিগুলোর নজির দেখিয়ে তিনি হুজুরের কাছে প্রমাণ করবেন—বিদেশী মাত্রেই মিথ্যা কথা বলেছেন, পাখি সম্বন্ধে তাঁদের কল্পনা ও জল্পনার মূলে কোনো তথ্য—যাকে বলে 'বস্তু',—তা নেই; কিন্তু বুধ-বৃহস্পতি কমিটির স্বর্ণ-লেখনী মায় মস্যাধার ও তাম্রশাসন! পাখিকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া বরং চলে কিন্তু সোনার মস্যাধার, রুপার তাম্রশাসন—এরা যে 'বস্তু', এদের জন্য যে খাতায় জমাখরচ লেখা রয়েছে এর বিল আছে ভাউচার আছে, রসিদ স্ট্যাম্প আছে—এগুলোকে তো ওড়ানো সহজ নয়।

এদিকে বেলা পাঁচটা হয়; ছয়টায় মজলিস। কর্মচারী নিরুপায় হয়ে স-উকিল নিজেই একবার পাখির খবর করতে অগ্রসর হলেন। বলা বাহুল্য যাত্রার পূর্বে কর্মচারী উকিলের পরামর্শ-মত বুধসভাকে খুব ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি দিয়ে গেলেন যাতে ভবিষ্যতে রিপোর্টাদি বিষয়ে তাঁরা সতর্ক থাকেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পত্র না পাওয়া পর্যন্ত এই পাখি সম্বন্ধে কোনো প্রকাশ্য সভায় কোনো আলোচনা না হয়—কেননা হুজুরের কানে তাঁদের এই অসাবধানতার কথা গেলে সভার বার্ষিকী ও চাঁদা ও অন্যান্য বাবদে খরচাদি সরকার হইতে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কর্মচারী ভাগা-তিলকাদি নানা ইষ্টিরিষ্টি দিয়ে আপনাকে বেশ সুরক্ষিত করে নিয়ে তবে পাখির সন্ধানে বাড়ির সদর দরজা পার হলেন, সঙ্গে সেই উকিল এবং হুজুরের সঙ্গীতাচার্য ও বুধ-বৃহস্পতি সভার জনকয়েক নামজাদা কবি ও লেখকবৃন্দ। মালীকে উকিল জেরা করে জানলেন যে বাগানের আর সমস্ত অংশই সে তন্ন-তন্ন করে দেখেছে—কেবল ঐ দিকটা—যেটা পাণ্ডব-বর্জিত দেশের মত —ওখানটি গিয়ে সন্ধান করতে সে সাহস পায়নি; কেননা সে জাতিতে উড়ে; ওদিকের হাওয়া গায়ে লেগেছে শুনলে তার জাত নিয়ে টানাটানি পড়বে। রাজার তাড়ায় কর্মচারীর জাতের কথা ভাববার সময় ছিল না, তিনি 'চুট্' বলেই সেই নিষিদ্ধ দিকটাতেই অগ্রসর হলেন। সঙ্গে সকলে চাদরের আড়ালে নাকগুলিকে নিষিদ্ধ দিকের হাওয়া থেকে ঢেকে নিয়ে কোন রকমে জাতি রক্ষা করে কর্মচারীর অনুসরণ করলেন। কর্মচারীর জাতি লোহার সিন্দুকে চব্‌সের ডবল তালার মধ্যে সুরক্ষিত ছিল, তার উপরে রাজ-আজ্ঞা, সুতরাং তিনি অনেকটা নির্ভয় ছিলেন।

এই পাণ্ডব-বর্জিত দিকে তখন বসন্তের ফুল ফুটেছিল, এত ফুল যে, তার সৌরভ চাদরের শত ভাঁজ দিয়েও ঠেকানো যায় না—কাজেই জাতি জাতীফুলের জাঁতি-কলে বলির পাঁঠার মত আর্তনাদ শুরু

করেছে। কর্মচারী ধমক দিয়ে উঠলেন—'চুপ্‌'! তাঁর সেই জলদ-গম্ভীর স্বরে একটা শুকনো কুয়োর ঘুমন্ত ব্যাং হঠাৎ বর্ষার স্বপ্নে মক্ মক্ করে খানিকটা বকে উঠল, এবং দূর বনে একটা বাছুর কোন আকস্মিক উৎপাতের আশঙ্কায় হাম্বা-রবে হরি-স্মরণ করতে থাকল।

কর্মচারী ও তাঁর দলবল—এঁদের কারুর পাখির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় মোটেই ছিল না। কিন্তু 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল'—এর মধ্যে থেকে যে সার বস্তুটুকু পাবার তা তাঁরা সকলেই পেয়েছিলেন। ফুল যখন ফুটেছে তখন হাম্বা ও মক্‌মক্ যে পাখিরই রব সে বিষয়ে তাঁরা একমত হয়ে ঐ তুটো জীবকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে চললেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। উকিল সন্ধ্যাকালের রবগুলোকে পাখির রব বলে ধরা যায় কি না এবং একটা পাখি তুটো জীব হয় কী বলে,—এ-বিষয়েও একটু আপত্তি করায় 'অধিকন্তু ন দোষায়' এবং রাতি পোহানোটা যে প্রাচীন কবিদের মতে দিবানিদ্রার পরেই সায়ং-সন্ধ্যাটাকেই বলা হয় এটি বুধ-সভার কবি ও লেখকবৃন্দ সকলে মিলে সমস্ত পথটা তর্ক করে বোঝাতে বোঝাতে চললেন। এবং হুজুরের সঙ্গীতাচার্য এই তুই জীবের রবে কোথায় ওড়ব, কোথায় বা খাড়ব ষড়জ গান্ধার মধ্যম ইত্যাদির বিচার করে এদের গান হনুমানের মতে সিদ্ধ ও শুদ্ধ বলেই স্থির করে নিলেন,—যদিও কোনো-কোনো ওস্তাদ নন্দিকেশ্বরকে একেবারে ছেঁটে দিতে নারাজ ছিলেন। এক পাখির স্থানে তুই নিয়ে যখন সদলে কর্মচারী হুজুরের মজলিসে দেখা দিলেন তখন চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল, এবং তুই পাখির সঙ্গীতের শ্রোতা এত জমে গেল যে হুজুরের উঠোনে সকলের স্থান-সঙ্কুলান তুর্ঘট হয়ে পড়ল। কোনোমতে সকলকে তুষ্ট করে কর্মচারী হুজুরে হাজির হয়েছেন। হুজুরের তাকিয়ার বামপার্শ্বে বাতি ও পুষ্পমাল্য ও তাম্বুলাদি, আর দক্ষিণে অধ্যাপক শাস্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশের দল। মজলিস দেশের গণ্যমান্য সঙ্গীতসভা-সঙ্ঘ ও সমিতির সদস্যে ভরা। এ ছাড়া খবরের কাগজওয়ালারাও শুভাগমন

হয়েছিল। অধ্যাপক প্রথমে স্বরচিত স্বস্তি-বাচন পত্রখানি পাঠ করলে পর কর্মচারী নম্বর-এক বিহঙ্গকে হুজুরে দস্তুর-মতো পেশ করলেন; হুজুরও তাঁকে যথাযথ আপ্যায়িত করে গানের জন্য ধরে পড়লেন। নম্বর-এক এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ভালোমানুষটির মতো অপেক্ষা করছিলেন। হুজুরের অভয় পেয়ে বরাবর অধ্যাপকদের নিকটে গিয়েই উপবেশন করলেন এবং তাঁদের হাতের কুশ-মুষ্টির দিকে মুখ বাড়িয়ে একটিমাত্র হাম্বারব করেই ক্ষান্ত হলেন। এখানে হুজুরের দৃষ্টি কর্মচারীর দিকে পড়বামাত্র তিনি দুই নম্বরকে হাজির করলেন। মজলিসে প্রবেশ করেই নম্বর-দুই বাতির চারিদিকে ভ্রাম্যমান একটি মশাকে গ্রাস করে ফেললেন; এবং হুজুরকে একবার মক্‌মক্ শব্দে আশীর্বাদ করেই আকাশের দিকে দুই চক্ষু পাকিয়ে পুষ্পমাল্যের থালার উপরে গম্ভীর মূর্তি ধরে বসলেন।

সকলের মুখে কেমন একটু নিরাশ ভাব দেখা গেলএবং মজলিসের বাহিরের লোক যারা নিমন্ত্রণ পায়নি তারা যেন একটু টিটকার দেবার

উদ্যোগ করলে। সকলকারই মনে হচ্ছে পাখি সম্বন্ধে কোথায় যেন একটু গোল রয়ে গেল। হুজুর পর্যন্ত কেউ তাঁরা পাখিকে কখনো দেখেনও নি, দেখবার চেষ্টাও পান নি। সুতরাং সবাই বিরক্ত হয়ে বসলেন এবং দুই জীবের সুর লয় তান নাদ নিনাদাদি সম্বন্ধে বিচার ও সুখ্যাতির চূড়ান্ত করে ও বিদেশীরা যে পাখির সুখ্যাতি করেছেন তাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিয়ে মজলিস ভঙ্গ করলেন। পণ্ডিত এই সময় কর্মচারীর কানে গিয়ে পরামর্শ দিলেন—'ওহে এ দুটোকে হুজুরে কী বলে হাজির করলে? এর একটি গোবৎস আর-একটি কূপমণ্ডুক,—কোনো পুরুষে পাখি নয়। একটিকে গো-রক্ষিণীতে পাঠিয়ে দাও, আর-একটি নিয়ে তুমি মশাবংশকে ধ্বংস কর গিয়ে।' কর্মচারী এতগুলো কথার জবাবে বললেন—'চুট্!'

মজলিসের দেউড়ির বাইরে সেই কচি মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। সে কর্মচারীকে আসল পাখির খবর দিতেই এসেছিল। কিন্তু পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখে সে আর কর্মচারীর কাছে যেতে সাহসই পেলে না।

হুজুর ঘরে এসে মিথ্যার ঝুড়ি বিদেশী বইগুলোকে জ্বালিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কর্মচারীর ঘর থেকেও সেদিন অনেক রাত্রে একটু কাগজ-পোড়া গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল আর বুধ-বৃহস্পতি সভায় পুঁথি-রক্ষককে ওখান থেকে ঠিক তেমনি সময়েই পকেটে হাত দিয়ে হাসি-মুখে বার হতে দেখা গিয়েছিল।

বিদেশীয় 'সুরসিক সভায়' হুজুরের মজলিসের বিবরণ এবং পাখির সম্বন্ধে উক্ত মজলিসের চূড়ান্ত মীমাংসার খবর পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই! কেননা হুজুরের যারা হুজুর এমন সব দেশীয় ছেলে-ছোকরা ও স্কুল-বয়ের দলেব সঙ্গে যোগ দিয়ে বুড়ো বুড়ো যত বিদেশীয় মহাপণ্ডিতেরা হুজুরকে একটি রঙচঙে টিনের পাখি প্রাইজ পাঠালেন, তার পেটে একটা গ্রামোফোন ও মোহিনী ফ্লুট পোরা ছিল। শুভদিন দেখে দেশের যত লক্ষ্মী ছেলেরা সেই পাখিটি নিয়ে খুব ঘটা করে হুজুরকে একটি অভ্যর্থনা দিতে এল এবং মজলিসের মধ্যখানে এসে যন্ত্রটায় কষে

দম লাগিয়ে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করে রইল। দু-চারটে মোটা গলা, দু-দশটা মিহি গলার গানের পর ফোনটা একেবারে চুপ করেই প্রকাণ্ড ঝড়ের মত একটি হাসি শুরু করলে,—সে একেবারে বিলিতি হাসি, তার চোটে হুজুরের পুরোনো মজলিস-ঘরের দেওয়াল চটে ফেটে চৌচির হয়ে হাওয়ার মুখে তাসের বাড়ির মতো ভেঙে পড়ল—একেবারে হুজুর, তাঁর কর্মচারী ও সদস্যবৃন্দের ঘাড়ের উপরে! ঠুন্‌কো মাটির দেওয়াল, আঘাত মোটেই মারাত্মক হল না, কেবল সকলে বিষম ভয় খেয়ে চিৎকার করতে লাগল—'ওরে গোহত্যা করলে রে!' এই সময় পাণ্ডব-বর্জিত দিক থেকে যত লক্ষ্মীছাড়া—তারা সেই ছোট জাতের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে হুজুরের ভাঙা মজলিসে দল বেঁধে দেখা দিলে। সেই মেয়ের গলায় পাখির গানের সুর হীরের সাত-নলী হারের মত ঝকঝক করছে!

কারিগর ও বাজিকর

কারিগর যেখানে থেকে কারিগরি করে সে দেশে কাজ হয় আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে। এতটুকু বীজ যেমন হয়ে ওঠে মস্ত গাছ আস্তে আস্তে, গুটিপোকা যেমন আস্তে ধীরে হয়ে ওঠে রঙিন প্রজাপতি, সেইভাবে কাজ চলে কারিগর-পাড়ায়। হঠাৎ কিছু হবার জো নেই সেখানে। আর বাজিকর পাড়ায় যেখানে বাজিকর কারসাজি করে সেখানে সবই অদ্ভুত রকমে হঠাৎ হয়ে যায়। হাউয়ের পাঁকাটি ফোঁস করে আকাশে উঠে ঝর-ঝর করে তারা-বৃষ্টি করে পালায়। লাল বাতি হঠাৎ সবুজ আলো দিয়ে দপ্ করে জ্বলেই নেভে—হয়ত কোথাও কিছু নেই একটা বোমা হাওয়াতে ফাটলো আর রাতের আকাশ দিনের সমস্ত জানা অজানা পাখির কিচমিচিতে ভরে গেল।

কারিগরকে কেউ বড়-একটা চেনে না, কিন্তু বাজিকরের নাম ছেলে-বুড়ো রাজা-বাদশা ফকির সবার মুখেই শোনা যায়। পয়সাও করে বাজিকর যথেষ্ট আজগুবি তামাসা দেখিয়ে।

এক সময় রাজসভায় কারিগর আর বাজিকর দুজনেরই কাজ দেখাবার হুকুম হল। যেখানে যত কারিগর যত বাজিকর সবাই যে-যার গুণপনা দেখাতে হাজির আপনার আপনার দলের সর্দারকে নিয়ে। দুই দলের মধ্যে এক মাস তেরো দিন লড়াই চলেছে, কোনো দল জেতেও না হারেও না। ভূত-চতুর্দশীর দিন রাজা দিলেন ছুটি দুই সর্দারকে শেষ হার-জিতের জন্য প্রস্তুত হতে।

ভূত-চতুর্দশীর সারা রাত বাজিকরের ঘরে কারো ঘুম নেই। পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা লোহাচুর করতে বসে গেল, তাই নিয়ে বাজিকর

অদ্ভুত সব বাজি গড়লে যা কেউ কখনো দেখেনি। তার উপর গাছ-চালা নল-চালা থেকে আরম্ভ করে যা কিছু বিষয় তার ছিল সব একত্র করে সে একটা মস্ত সিন্দুক ভর্তি করে ভোর না-হতে রাজ-বাড়িতে গিয়ে হাজির হল, সঙ্গে পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা তাল ঠুকে ডিগবাজি করে যেন সভা চমকে তুললে।

রাজা সভা করে বসে আছেন, রানীরা আড়াল থেকে উঁকি দিতে লেগেছেন। বাজি শুরু হয় কিন্তু কারিগরের দেখা নেই। রাজা ব্যস্ত হয়ে বলেন—'গেল কোথায় ?'

বাজিকর হেসে বলে—'মহারাজ, সে তার একগণ্ডা চেলা নিয়ে বোধহয় রাতারাতি চম্পট দিয়েছে। অনুমতি দেন তো বাজি কাকে বলে দেখাই !'

বলেই বাজিকর একলাফে আকাশে উঠে হাওয়ার উপর তিন-চারটে পাক খেয়ে ঝুপ্ করে একেবারে রাজার ঠিক সিংহাসনটা বাঁচিয়ে মাটিতে সোজা এসে দাঁড়ালো। সভার চারিদিকে হাততালি আর সাধুবাদ শুরু হয়ে গেল। সেই সময় বাজিকর বিদ্যের সিন্দুক খুললে। অমনি চরকি বাজির মতো বন্ বন্ করে, ছুঁচো বাজির মতো চড়বড় করে বাজির ধুম লেগে গেল এমন যে কারু চোখেমুখে দেখবার বলবার অবসর রইল না। রাজা মহা খুশি হয়ে গজমোতির মালা খুলে বাজিকরকে দেন—এমন সময় কারিগর এসে হাজির হল একলা।

রাজা তাকে দেখে বললেন—'তুমি কোথায় ছিলে, এমন বাজিটা দেখতে পেলে না !'

কারিগর একটু হেসে বললে—'এইবার তবে আমার পালা মহারাজ ?'

বাজিকর তাকে ধমকে বললে—'তোমার পালা কি রকম ? এতক্ষণ এসে পৌঁছতে পারো নি, বেলা শেষ হয়েছে যাও !'

রাজা বাজিকরকে থামিয়ে বললেন—'না, তা হয় না। সময় আছে, এরই মধ্যে যা পারে ও দেখাক কারিগরি।'

একদিকে কারিগর আর একদিকে বাজিকর। কারিগর একটা পাখির পালক বাজিকরের হাতে দিয়ে বললে—'এইটে ওড়াও।'

বাজিকর পালকটা নিয়ে এক ফুঁ দিতেই সেটা উড়ে গিয়ে সভা ছাড়িয়ে মাঠে পড়লো। সভাসুদ্ধ কারিগরকে দুয়ো দিয়ে উঠল।

তখন কারিগর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে—'এইবার আমায় উড়াও তো দেখি কত বড় বাজিকর!'

সভাসুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলো, কী হয়! বাজিকর ফুঁ দেয়, কারিগর হেলেও না।

খানিক পরে বাজিকর চোখ রাঙিয়ে বললে—'কই তুমিই আমায় ওড়াও তো দেখি কত বড় কারিগর!'

কারিগর একটু হেসে একটা বাঁশিতে ফুঁ দিতেই একধার থেকে একটা লোহার পাখি সভার মধ্যিখানে কারিগরের চেলারা এনে হাজির করলে। কারিগর বাজিকরকে বললে—'এগিয়ে এসো। পাখির পিঠে চড়ে পড়, কেমন না-ওড়ো দেখি।'

কলের পাখির বিকট চেহারা দেখে বাজিকর শুকনো মুখে রাজার দিকে চাইতে রাজা বললেন—'আচ্ছা হয়েছে, আর পরীক্ষায় কাজ নেই ছেড়ে দাও।'

বাজিকর তখন বললে—'সে কি মহারাজ, ও আমায় ওড়াবে কি? লোকটা আগে নিজেই উড়ুক তো দেখি কেমন পারে! আমি মনে করলে এখনি ওর পাখিসুদ্ধ ওকে পালকের মতো এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারি। শুধু ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ রেহাই দিয়েছি। আর না, দেখাচ্ছি মজা এবার!'

কারিগর হাসতে হাসতে আপনার হাতে গড়া পাখির উপর সওয়ার হল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পাখি রঙীন আলোয় ডানা মেলে কারিগরকে নিয়ে মাটি ছেড়ে খুব আস্তে আস্তে আকাশে উঠতে আরম্ভ করলে। রাজা সাধুবাদ দিতে যাবেন এমন সময় বাজিকর পাখিটার পেটের তলায় দাঁড়িয়ে একটা মন্তর আউড়ে চারটে ফুঁ দিয়ে

বললে—'দেখেন মহারাজ। এবার একেবারে উড়লো। যাঃ ফুঁঃ! আর আসিস নে, ভাগ্!'

পাখি সন্ধ্যার অন্ধকারে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর ফিরল না।

রাজা বললেন—'এ বাজিকরটা যা বললে, তাই তো করলে!'

রাজা বাজিকরকেই বকসিস দিলেন।

কারিগর খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখে সভা শূন্য। কা কস্য পরিবেদনা। শুকনো মুখে অন্ধকারে শুধু তার একগণ্ডা চেলার মধ্যে মোটে একজন গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। বাকি চেলারা বাজিকরের কাছে বিদ্যে শিখতে চলে গেছে।

যুগ্মতারা

অসিধার নখাঘাতে দিল্লীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া শ্যেনপক্ষীর মত নাদির শাহ যেদিন হিন্দুস্থানের তখ্‌তে তাউস ছিনাইয়া লইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেলেন সেদিন অক্ষম বাদশাহ রঙ্গীলে মহম্মদ শাহকে দিল্লীর জগৎবিখ্যাত দেওয়ানি আম-এর শূন্য রত্নবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছিলেন অনেকেই—

'—সামতে আমালে মা, ইঁ সুরতে নাদির গ্রিফ্‌ত্‌।'

কপাল ভাঙিয়াছে, আমারই কর্মফল নাদির-মূর্তিতে দেখা দিয়াছে।

স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রের ন্যায় হতভাগ্য সেই মহম্মদ শাহের কপালের দোষ দিয়াছিল অনেকেই এবং তাহারই কর্মফল যে ফলিতেছে তাহাও বারবার বলিতে বাকি রাখিল না অনেকেই,—সালেবেগ ছাড়া। সালেবেগ ছিল বাদশাহের মুহুরি এবং চিত্রকর। গীতানুরাগী বাদশাহ সারাদিন ধরিয়া যে-সকল গান রচনা করিতেন সেগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে সাজাইয়া বিচিত্র চিত্রে ফুটাইয়া বাদশাহের কুতুবখানায় ধরিয়া দেওয়াই তাহার কাজ ছিল। সে ছিল রঙ্গীলে মহম্মদ শাহের 'জর্‌রী কলম'—সুবর্ণ লেখনী।

আম দরবারের মণি ভিত্তি আলোকিত করিয়া সোনার অক্ষর জ্বল-জ্বল করিতেছে—'ভূস্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এইখানে এইখানে।' ঠিক তাহারই নিম্নে হৃতসর্বস্ব মহম্মদ শাহ—এই ছবিটি সালেবেগের প্রাণে তীরের মতো আসিয়া বিঁধিতে বিলম্ব ঘটে নাই। সুতরাং যে সময়ে আর সকলে অদৃষ্টের ফের লইয়া ব্যস্ত সেই সময়ে কথা-মাত্র না

বলিয়া নির্বাক বাদশাহকে যথারীতি কুর্নিশ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে দরবার হইতে চলিয়া আসিল ও বাড়ি আসিয়া একটুকরা কাগজে সেইদিনের ছবিটি আর সেই ছবির নিচে মহম্মদ শাহের কাতর অর্ধোক্তিটুকুও লিখিয়া নিজের রং, তুলি, একখানি রুটি, এক ছুরি গুছাইয়া লইয়া অবিলম্বে সালেবেগ দিল্লী ছাড়িয়া কাবুলের পথ ধরিল। সালেবেগের ঘরে এমন কেহ ছিল না যে মহম্মদ শাহের সুবর্ণ লেখনীর খবরদারি করে,—না বিবি না বেটী। সঙ্গীর মধ্যে ছিল এক পোষা বুলবুল, খাঁচা খুলিয়া দিতেই একদিকে সে উড়িয়া পলাইল। পরদিন কলমের সন্ধানে লোক আসিয়া যখন বাদশাহকে গিয়া শূন্য খাঁচা ও খালি ঘরের সংবাদ দিল, কলমের কোন সন্ধানই দিল না তখন মহম্মদ শাহ বড় দুঃখেই বলিয়া উঠিলেন—

'হায়, ব্যথিতের আর্জি দুঃখের নিবেদন লিখিয়া প্রচার করিবার উপায় পর্যন্ত রহিল না। আজ অবধি মনের দুঃখ মনেই থাক, প্রকাশে কাজ নাই।'

*　　　　*　　　　*

চতুরঙ্গ বাহিনী চলিয়াছে, জয়দুন্দুভি বাজাইয়া নাদির চলিয়াছে, মসুদের মরুভূমির উপর দিয়া খর-রৌদ্রের ভিতর দিয়া অসূর্যম্পশ্যা রমণীর মত মোগল বাদশাহের রমণীয় সুখশয্যা ময়ূর সিংহাসন চলিয়াছে ; আর চলিয়াছে সেই সিংহাসন স্কন্ধে বহিয়া জর্‌রী কলম সালেবেগ সিপাহীর ছদ্মবেশে। অদূরে খর্জুর বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় রোজা ইমাম মুসিরেজা ; আরো দূরে মসুদের সুদৃঢ় কেল্লা। নাদিরি ফৌজ শাহের হুকুমে তখ্‌তে তাউস ইমাম রৌজায় উপঢৌকন দিয়া কেল্লায় প্রবেশ করিল। বহু অশ্রুপাত বহু রক্তপাতে কলঙ্কিত ময়ুর সিংহাসন পবিত্র মোকাবারায় উপহার দিয়া আপনাকে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী জানিয়া নাদির পরম সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন কিন্তু এবার নাদিরি হুকুম তামিল হইল না। মোকাবারা হইতে ময়ুর সিংহাসন কে জানে কে উপর্যুপরি তিন রাত্রি টানিয়া ফেলিতে

লাগিল। চতুর্থ দিনে ক্রোধান্ধ নাদির তলোয়ার খুলিয়া ইমামের রৌজার সম্মুখে সদর্পে দাঁড়াইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন—'রজা অজমন্ জঙ্গমি ক্ষাহদ্ !'—যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি ! প্রতিবারেই ইমাম মুসিরেজার শূন্য রৌজা হইতে প্রতিধ্বনি আসিল—'অজমন্ জঙ্গমি ক্ষাহদ্ জঙ্গমি ক্ষাহদ !' সত্য-সত্যই সেই রাত্রে সুখসুপ্ত নাদিরের নিকট যুদ্ধের আহ্বান পৌঁছিল এবং তাঁহার জীবন-যবনিকা শোণিতাক্ত করিয়া ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি তাঁহার জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে ভীষণ অঙ্কপাত করিয়া গেল।

* * *

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। যমুনার উপর দিয়া দক্ষিণবায়ু বহিতেছে—রঙমহলের সুপ্রশস্ত খোলা ছাদের উপরে সুন্দরী কাহারিয়াগণের স্কন্ধে সোনার তামদানে মহম্মদ শাহ সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন। আকাশে দুইটি মাত্র তারা দুইখণ্ড কোহিনুরের মত জ্বলিতেছে, নিভিতেছে। ঘরে ঘরে তখনও প্রদীপ জ্বলে নাই। এই সময় তাতারী প্রহরিণী আসিয়া বাদশাহের হস্তে একখানি তসবির দিয়া জানাইল—নাদির আর নাই ; সালেবেগ এইমাত্র মস্হদ হইতে সে সংবাদ লইয়া পৌঁছিয়াছে এবং বাদশাহের জন্য সামান্য উপহার হুজুর-দরবারে দাখিল করিয়াছে। মহম্মদ শাহ তসবিরখানি যত্নের সহিত উঠাইয়া লইলেন। তসবিরের এক পৃষ্ঠায় দেওয়ানী আম-এর দৃশ্য—শূন্য সভায় হৃতসর্বস্ব মোগল বাদশা। এই করুণ দৃশ্য ঘিরিয়া সোনার অক্ষর জ্বল-জ্বল করিতেছে—'সামতে আমালে মা ইঁ সুরতে নাদির গ্রীফ্ত্।' তস্বিরের অন্য পৃষ্ঠায় নাদিরের রক্তাক্ত দেহের উপরে ছুরিকা-হস্তে সালেবেগ, আর সেই ছবি ঘিরিয়া রক্তের অক্ষর মাণিক্যের মত জ্বলিতেছে—

'বয়েক্ গর্দিসে চরখ্ নীলোক্ষরি
না নাদির বজা মুন্দ নে নাদরী।'

সুনীল নীলাম্বুজের ন্যায় নীলাকাশ একটিবার মাত্র আবর্তিত হইয়াছে কি না, ইহারই মধ্যে নাদিরের সঙ্গে নাদিরি হুকুম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

বাদশাহ যখন তসবির হইতে মুখ তুলিলেন তখন আকাশে কেবলমাত্র একটি তারা যমুনার জলে ছায়া ফেলিয়া ঝিক-ঝিক করিতেছে।

আলোয় কালোয়

পুবের পাখি তারা বাসা বেঁধে থাকে মলয় দ্বীপে চন্দন বনে। ঝাঁক বেঁধে ওড়ে পুব আকাশে সোনার আলোয়। ধান-ক্ষেতের কচি সবুজ মেখে নিয়ে সবুজ হল তাদের ডানা, হিঙ্গুল ফলের কষ লেগে হল রাঙা তাদের ঠোঁট।

তার একটি পাখি একদিন ধরা পড়লো। সওদাগর তাকে জাহাজে করে নিয়ে গেল, উদয়াচল ঘুরে পশ্চিম সাগর পার হয়ে আজব সহরে। সেখানে সবুজ নেই—কেবল বাড়ি, কেবল বাড়ি! ইট, কাঠ, চুন, সুরকি, কলকারখানা, ধুঁয়া ধুলো আর কুয়াসায় দিকবিদিক আকাশ বাতাস পর্যন্ত ঢাকা, দিন রাত্রি সমান অন্ধকার। আলোগুলো যেন সেখানে জ্বলছে না। কুয়াসায় ভিজে কম্বলমুড়ি দিয়ে রাস্তার ধারে বসে সে জ্বরে কাঁপছে। সূর্যের রথ সহরের পাঁচিলে এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় সহর ছেড়ে। মলয় বাতাস দুয়োরের কপাট ধরে নাড়া দিয়ে দেখে কিন্তু ঘর খোলা পায়না কোনদিন।

সবুজ পাখি সেখানে খাঁচায় রইলো—কালো লোহার শক্ত খাঁচা—কলের কুলুপে চাবি-দেওয়া খাঁচা। খায় দায় পাখি, থেকে-থেকে কুলুপ নাড়া দেয়, কুলুপ নড়ে চড়ে কিন্তু খোলে না। কল-ঘরের এক কোণে পাখির খাঁচা—কলের ধুঁয়া থেকে-থেকে ভুষো ছিটিয়ে যায় তার গায়ে, সবুজ পাখনা কালো হয় দিনে দিনে। পাখি সেখানে থাকে মনের দুঃখে, শুনতে শুনতে শেখে সব খটোমটো বুলি, যেন লোহার কলের খট্‌খটাং। তাই শুনতে লোক জড়ো হয়। সেই কলের ছাই-ভস্ম মাখা পাখ্‌না দেখে অবাক হয়ে যায়—এ কী আশ্চর্য

পাখি! নাচতে পারে, গাইতে পারে, বলতে পারে, কইতে পারে, পড়তেও পারে! পাখি সে থেকে থেকে নিজের কথা চেঁচিয়ে বলে—'ওরে উড়তে পারিনে রে, উড়তে পারিনে—বেঁচে আমি মরে আছি!' থেকে-থেকে রাগ করে গা-ঝাড়া দেয়—লোকে তার মনের কথা বোঝে না, তামাসা দেখে হাসে হাততালি দেয়। আজব সহরের মানুষ তারা কেউ বোঝে না মলয় দ্বীপের পাখির কী দুঃখ। তার দুঃখুটা বোঝে শুধু ভোরের আলো। সে কোনোদিন কুয়াসা সরিয়ে কারখানা-ঘরের কোণটিতে এসে দেখা দেয়, সবুজ পাখির গায়ে হাত বোলায়। ভয়ে-ভয়ে আসে আলো, ভয়ে-ভয়ে সরে যায়। পাখি বলে—'যদি কোনদিন সিন্ধু-পারে যাও হে আলো, তবে ভুলো না, মলয় দ্বীপের সবুজ ঘরে আমার খবর পৌঁছে দিও; বোলো আমি বেঁচে মরে আছি!'

আলো বলে—'যেদিন আমি বড় হয়ে উঠবো সেদিন নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার কথা তোমার আপনার লোকের কাছে জানিয়ে আসবো।'

শীত কাটলো, পরিষ্কার হল দিনে দিনে আকাশ, আলোর তেজ বেড়েই চলল। আর সে ভয়ে-ভয়ে আসে না; অন্ধকারের ঘরে আসে রানীর মতো চারিদিক আলো করে, কারখানার কলকব্জা ঝকঝক করতে থাকে আলো পেয়ে। পাখি আলো-মাখা ডানা কাঁপিয়ে বলে—'আর কেন, এইবার।' আলো বলে—'থাকো থাকো, আজ রাতের শেষে খবর পাবে!'

খাঁচার পাখি ছট্‌ফট্ করে—সকাল কখন হয় তারই আশায়।

সেদিন ভোরের বেলায় কলের খাঁচায় ধরা ক্লান্ত পাখি ঘুমিয়ে গেল—সেই সময় কলখানায় বাঁশি ডাক দিল কুলিদের।

পাখির কাছে আলো এসে বললে চুপি চুপি—'মলয় দ্বীপে গিয়েছিলেম, তাদের তোমার দুঃখের খবর দিলেম!'

পাখি ঘুমন্ত চোখ একটু খুলে শুধোলো—'তারা কী বলে পাঠালে শুনি?'

আলো খাঁচার মধ্যে এগিয়ে এসে বললে—'সবাই আহা করলে, কেবল একটি পাখি সে যেমন ছিল তেমনই রইল।'

পাখি ঘাড় তুলে বললে—'তারপর ?'

আলো তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে—'তারপর সে ঝরা-পাতার মতো গাছের তলায় লুটিয়ে পড়লো ধুলোতে, আর সবাই বললে—আহা মরে বাঁচলো রে!'

খাঁচার পাখি আর কোনো সাড়া দিলে না।

কল-ঘরের কল চললো তেজে—খট্‌খটাং।

যাব পাখি সে খাঁচার কাছে এসে দেখলে—পাখি মরে গেছে, আলো তার উপর পড়ে কাঁদছে।

ইচ্ছাময়ী বটিকা

খাতাঞ্চিখানার পুরোনো চাকর সোনাতন বদলি দিয়ে গেছে তো গেছেই। ঠাকুরবাড়ির পোষা পাখিকে কৃষ্ণনাম পড়াতে ভর্তি হয়েছে পিলে-গোবিন্দ, আর খাতাঞ্চিমশায়ের বালিশের খোল হুঁকো কলকির খবরদারিতে এসে গেছে আর-একটা লাল গামছা কাঁধে উল্কি-পরা দামোদর পিতল গোঁসায়ের আখড়া থেকে গাঁজার কলকি আর ছুঁচোর কেত্তনে ফাস্টক্লাস পাশ হয়ে। আমি আর অবিন ঘরে ঢুকতেই খাতাঞ্চিমশায় হাঁক দিলেন—'অনাটন, অনাটন!' তারপর আমাদের বসতে ইঙ্গিত করে বললেন—'এই যে এসে গেছ, কাশী যাওয়াই ঠিক তো?'

অবিন চায় আমার মুখে, আমি চাই অবিনের দিকে। দুজনেই এক সঙ্গে ঘাড় নাড়লেম মান্দ্রাজীতে—হ্যাঁ কি না বুঝতে দিলেম না।

খাতাঞ্চিমশায় কলকি-শূন্য গড়গড়ায় তিনটান দিয়ে বললেন—'ফর্দখানা?'

বাক্স বালিশ উল্টে ফর্দ মেলে না। এই ফাঁকে অবিন দেখি সরে পড়ল। তক্তপোষের তলায় পাটাতন-বন্ধ দেরাজ থেকে চালের কাছে মাটির লক্ষ্মীপ্যাঁচার কুলুঙ্গিতে চড়াই পাখির বাসাটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে যখন ফর্দ পাওয়া গেল না তখন খাতাঞ্চিমশায় গুম্ হয়ে দুই ভুরু কুঁচকে হাতকাটা ফতুয়ার বন্ধক দিয়ে দড়ি-বাঁধা ভাঙা-ডাঁটি চশমার পরকলাদুটো জোরে জোরে ঘসতে থাকলেন। তারপর দুবার চোখ পিট-পিট করে—'ইচ্ছাময়ী তোমারই ইচ্ছে'—বলে একটা নিশ্বাস ছেড়ে গড়গড়া টেনেই চললেন—ধুঁয়া বার হয়না সে খেয়াল নেই।

সোনাতোন থাকলে ফর্দ নিয়ে আজ ধুন্ধুমার বেধে যেত। কিন্তু আজকাল নতুন চাকর-বাকর আসা অবধি খাতাঞ্চিমশায় কেমন যেন দমে পড়েছেন। সর্বদা অনমন উদাস ভাব, যেন কোনো কিছুতে ইচ্ছে নেই। 'ফর্দটা গেল—যাকগে,' বলেই হাই তুললেন—যেন একটা বোড়া সাপ মুখ ব্যাদান করে একটা খাবি খেলে। সেই সেদিনের খাতাঞ্চিমশায় বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া বনে আছেন দেখে ভালো লাগল না। বললেম—'খুব করে ধমক লাগান, ফর্দটা তবে বার হবে।'

—'না হে, বোঝ না, আজকাল দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। সে আমল গেছে। জাঁকজমক ধমক-ধামক করতেই ইচ্ছে হয় না। থাকতো 'সোনাতন তো—হাঁ!' বলেই খাতাঞ্চিমশাই হাঁক দিলেন —'অনাটন, অনাটন!'

নতুন কল্‌কিতে ফুঁ দিতে দিতে লাল গামছা কাঁধে অনাটন হাজির। খাতাঞ্চি বাঁ হাত বাড়াতেই অনাটন গাঁট থেকে ফর্দটা বার করে তাঁর মুঠোয় গুঁজে দিয়ে গুল ওসকাতে থাকল। হুঁকোর নল ভেবে ফর্দটা মুখে দিতে যান দেখে অনাটন জোরে কলকিতে ফুঁ দিতে শুরু করলে। আমি বলে উঠলেম—'ওটা সেই ফর্দটা!'

—'তাই তো!' বলে ফর্দটা বাক্সে তুলতে যান দেখে আমি বললেম—'দেখি না!'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'অনাটনের হস্তাক্ষর পড়েন আর পড়ে বোঝেন, তিনি এখনো, কি বলে ভালো—দেখ চেষ্টা করে!' বলেই খাতাঞ্চিমশায় ফর্দটা আমায় দিলেন।

ফর্দটা আগাগোড়া হিজিবিজি, যেন ফার্সিতে লেখা। কেবল কলমের খোঁচ, যেন মুরগির একরাশ ছেঁড়া পালক উড়ছে—তলাতে নাম সই—দামোদর ওরফে অনাটন।

আমি দেখে বললেম—'দামোদরের নাম অনাটন রাখলেন কেন? সনাতনের সঙ্গে ছন্দ মেলাতে নাকি?'

—'ফর্দ দেখে বুঝলে না, ভূস্বামী-বিত্তের কতখানি অনটন ?'

—'কিন্তু ওর টেরি থেকে রেলির ধুতির চুলপাড়টি পর্যন্ত কোথাও তো কিছুর অনটন দেখছি নে !'

খাতাঞ্চিমশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—'সেই কারণেই তো কাশী পালাবার মতলব করেছি। মেরে-ধরে ধমকে জবাব দিয়ে ফল হয় না। দেখি এ উপায়ে যদি ঝেড়ে ফেলতে পারি অনাটনকে। ব্যাটা যেন কী—'

বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে খাতাঞ্চিমশায় ঘড়ির দিকে চাইতেই অনাটন হাত বাড়িয়ে একটা রাংতা-মোড়া কৌটো খাতাঞ্চিমশায়ের হাতে দিয়ে বললে—'এই এককৌটো বই আর দোকানে নেই।'

খাতাঞ্চিমশায় অমূল্য জিনিসের মতো কৌটোটা নিয়ে নাড়চেন চাড়চেন দেখে বললেম—'কৌটোটা কিসের ?'

—'ইচ্ছাময়ী বটিকা হে, বড় ভালো জিনিস !' বলেই একটা বড়ি নিজের গালে দিলেন, একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—'খেয়ে দেখ।'

গুলিটা খেয়ে নিলেম। মনে হল যেন খানিক বরফ আর জিনতান আর ভাম্বুলিন, গোলাপজাম, লকেট, আমরস, কলার বড়া, তাল-ফুলুরি, খেজুর, কিসমিস, মোতিচুর, মিহিদানা, ভীমনাগ একসঙ্গে মুখের মধ্যে খানিক কিটিমিটি খেলে গলায় তলিয়ে গেল।

—'ইচ্ছাময়ী, তোমারি ইচ্ছে !' বলে খাতাঞ্চিমশায় নল টানলেন। সরু সুতোর পৈতের মতো একগোছা ধুমা বাতাসে উড়লো। দুজনে চুপচাপ, ঘরখানা থম্‌থম্ করছে। হঠাৎ খাতাঞ্চি-মশায়ের দাঁড়ি গোঁফ ঠেলে একটা ঝড় যেন বেরিয়ে এল—'ব-স্-স্ !' আর সেইসঙ্গে পাকা গুল খামিরা তামাকের একরাশ ধুঁয়া সাদা যেন বাস্তুসাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে চললো চালের কাছে সেই কুলুঙ্গিটার দিকে যেখানে রং-করা মাটির লক্ষ্মী-প্যাঁচা বসে আছে।

একটা শেষটান দিয়ে খাতাঞ্চিমশায় বললেন,—'অনাটন, পাঁজি দ্যাখ্ তো শুভদিন কবে!'

—'আবার বিয়ে করবেন নাকি?'

—'না হে যাত্রার দিনটা দেখা চাই।' এটা হল কী মাস ভালো? চৈত্রমাস। তিথিটা? একাদশী। বার তারিখ শকাব্দ খ্রীস্টাব্দ সম্বৎ কিছু মনে পড়ছে না ছাই—দ্যাখ না অনাটন।' অনাটন সে ঘাড় গুঁজে পাঁজির যতো পাতা উল্টেই চললো—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। খাতাঞ্চিমশায় হাত উঠিয়ে বললেন—'রোসো মনে পড়েছে, সাঁইত্রিশ শো তেরো সাল। ইয়ার কী হোলো তাহলে দেখ তো ভাই।' বলেই ফর্সির নলটা মুখে তুললেন।

আমার মনের মধ্যে যেন সেলেট আর পেনসিল নিয়ে ইংরিজি টুকটাক খেলে চললো—তেরো প্লস একশো ত্রিশ ইনটু সাঁইত্রিশ ডিভাইডেড বাই সাল ইনটু সোন ইনটু শক মাইনাস হিজরি ব্র্যাকেট শকাব্দ প্লস সম্বৎ অ্যাডেড টু খ্রীস্টাব্দ। খেলা কতক্ষণ চলে? একবাজি শেষ হয় আর খাতাঞ্চিমশায় কন—'হল?' অমনি তেজে শুরু হয়—প্লস মাইনাস ইনটু ড্যাশ। সেলেটে আর জায়গা হয় না, পেনসিল প্রায় ক্ষয়ে যায়, মাথা চুলকোয়, পেট ফোলে, অনাটন পাশ কাটায়। খাতাঞ্চিমশা-র রুপো-বাঁধা ফর্সি বলে চলে—'চলুক, চলুক, ফিস্ ফিস্, আশিবিষ, দশ পঁচিশ, এক চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ।' বলতে বলতে হুঁকোটা যেমন বলেছে 'ঊনপঞ্চাশ, ফুরুৎ'—অমনি দেখি খাতাঞ্চি নেই, পিতুম নেই, কুলুঙ্গি নেই, তার মধ্যে মাটির লক্ষ্মী-প্যাঁচা নেই, দেয়ালের গায়ে টিকটিকি নেই। নেই ভেতর ওপর ইস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল টাইম টেবল, উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম কলকাতা চিৎপুর কাশীপুর ইত্যাদি এট্সেট্রা, এমনকি খাতাঞ্চিমশায়কেও কে যেন রবার দিয়ে ঘসে মুছে দিয়ে গেছে। আছে শুধু পড়ে একটুখানি তামাকের গন্ধ আর মস্ত সাদা জাজিমখানা যতদূর চোখ চলে ততদূর টানা যেন সাহারা মরুভূমি বা মাকুল ময়দান। তারই

উপর দিয়ে একসার পিঁপড়ে না উঁটের কাফিলা চলেছে দেখি একটা যেন মিরাজের দিকে। থামগুলো দেখি যেন খেজুর গাছের গুড়ি। মাথার উপর ছাদ খুঁজে পাইনে। চোখ বুজলে দেখছি সর্ষে ফুল, চোখ চাইলে দেখছি অনাছিষ্টি। এই সময় শুনি কে বলছে— 'আকাশখানা দেখাচ্ছে যেন নীল পতাকাতে চন্দন নিকেচে।' গলার স্বরটা পিলে-গোবিন্দর গলার মতো। কানামাছির ভনভনানির মতো খানিক ঘুরে ফিরে আবার কানের কাছে এসে বললে—'হায় হায় দিগ্‌ভিরমি লাগলো দেখি!' তারপর স্বয়ং পিলে-গোবিন্দ মূর্তিটা নিজের গজভুক্ত কপিত্থবৎ ন্যাড়া মাথা দুই হাতে ধরে থপাস করে কোলাব্যাঙের মতো সামনে এসে বসলো, আর কথা কয় না। নিঃসাড়া অন্ধকারে যেন ওৎ পেতেছে আমাকে শিকার করবে বলে এমনি মনে হল। মনের ভিতরটা পর্যন্ত যেন বোবা করে দিয়েছে সে। বুকটা ধড়ফড় করতে থাকলো যেন বাঁয়া-তবলা বেজে চলেছে—

ধর্ ধর্ মার্ মার্
ঘাড় ভাঙ্ যার তার।

একশোর ছুটো শূন্যের মতো গোবিন্দর ছুটো চক্ষুকোটর থেকে বোল আর আখর একাদশ অক্ষৌহিণীর মতো ছুটে বার হল—

চটাপটি উলটি পালটি
ঝটাপটি মাথা ফাটাফাটি আর!

আমার তখন কথা সরছে না—এগোই কি পিছোই এই ভাব। 'গোবিন্দাই' বলে একেবারে দণ্ডবৎ মুখ থুবড়ে। দূরে থেকে একটা আওয়াজ এল—'সুভরবান-ই-ই।' আমি শুনলেম কে যেন ডাকলে —'অবন-ই।' গলাটা যেন খাতাঞ্চিমশায়ের মতো গম্ভীর সুরিলা!

মাথা তুলে এদিক ওদিক চেয়ে দেখি একটা যেন সাদা বালিসের ঢিবি থেকে এক মূর্তি নেমে এলেন।

পরনে হায়কল জোব্বা, হাতে ডাণ্ডা মাথায় টোপ।
পায়ে চাপটি চামড়া বান্ধা, সাদা কালো দাড়ি গোঁফ!

দেখেই আমি আদাব বাজিয়ে নাকে খৎ। নাকটা ছড়ে সুনছাল উঠে ফুলে উঠলো গোল মুলোবৎ।

শুধোলেম—'হুজুরকা ইসমে সরিফ!'

ভারি গলায় উত্তর হল—'মুসফিতর মুসাফির।'

উর্দু বিদ্যে আমার হালে পানি পেলেনা। সুরে বুঝলুম আরবিতে একটা আশীর্বাদ হয়ে গেল। আমি একেবারে দস্তাবস্তা সটান কদম বোসি বাজাতে উপুড় হয়ে পড়লেম। মুখ তুলতে আর সাহস হয় না —আশীর্বাদ চলেছে শুনি—

খুরমাদারে খুদ্‌বখারি ইদ্‌গথা
মস্তেজারে হামন্‌দোস্তি বিশ্‌খতা।

এতক্ষণে একটা বাংলা কথা পেয়ে যেন প্রাণ বাঁচলো। খাতাঞ্চি-মশায় প্রায়ই জমিজমার হিসেব করতেন—বিশ্‌খতা ত্রিশ্‌খতা কথাটা কানে ছিল। কিন্তু, কে ইনি এলেন দেখি, বলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই গেল পা টলে। যেন টোলের পড়ুয়াতুটো সমস্কৃত পড়তে লেগেছে—নৃত্যং বাদ্যং গীত-কলিতং বলিতং চলিতং উঠিতং পড়িতং। বিচলিতং হয়ে কোনো রকমে খাড়া হয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই—সুনসান ময়দান আধি রাত ইধর আধি রাত উধর হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছি একা প্রাণী ছাহারা বালির মধ্যে, ধড়টা সমসকৃতর ঝোঁক সামলে নিয়েছে তখন। গজনের গাঁজলা ভাঙতে লেগেছে মুখ খিদের আর তেষ্টার চোটে।

গর্দবাদের ওর্দানশীল কোর্মা ক্ষেতের খোসবু
জিলদে ধরা বুলবুলির গান খুঞ্চে ঢাকা বস্তু।

নুন-মরিচি একটা জোর হাওয়াতে মরুভূমির মাঝে কোর্মা আর শিককাবাবের গন্ধ নাকে এসে লাগল। আমি একেবারে যেন আপাদ-মস্তক হঠাৎ উর্দু বেশ বনে গিয়ে হাঁক দিলেম—'কোই হ্যায়?'

দেখি না, অনাটন ছুটে আসছে—গায়ে গেঞ্জি মাথায় খদ্দরের টুপি। আমায় দেখে মুখ থেকে বিড়িটা ফেলে বললে—'কি চাই?'

আমি বললেম—'আমি চললেম ; কিছুই বুঝছিনে কে বা আমি কে বা তুমি, কোথায় বা আছি, কী বা করি।'

হেললো না দুললো না, আকাট হয়ে রইলো অনাটন। সরু কলমে টানা একটা বিস্ময় আর প্রশ্নের চিহ্ন যেন এক করে লেখা—একটা আঁকড়ি মাত্র।

আবার নুন মরিচি হাওয়া বইল, গজল গনগনিয়ে উঠল আমার গলা পর্যন্ত—

নুন মরিচ গলদা চিংড়ি
ঝোল কাবাবি দোলমা
কোর্মাবাগের মুর্গাদারি
পিক্‌কাবাবি খোরমা
সুর্মা কাজল রাতে রাতে
গরমাগরম টুক্‌রা
গুল মুর্গার খুনখারাবি
বখরেদারি বখরা !

অনাটনের গলা দিয়ে সুর বার হয়না, দেখি কেবল তার গলার টুঁটিটা ওঠে নামে, যেন নিঃশব্দে তালে তালে মোরগ ডাকছে—কোঁকর কোঁ !

গজলের ফাঁকে ফাঁকে নুন-মরিচি হাওয়া এক-একবার মুখে যেন একটুকরো কাবাব ফেলে দিয়ে যায়। গজল পিষে চলে দাঁত, এমনি দমে দমে যখন শিকের ডগাতে পৌঁছেছি তখন অবিন এসে হাজির—'কি হচ্ছে', বলে।

আমি বললেম—'গুল মুর্গার মিল খুঁজছি, কথা পাচ্ছিনে।'

অবিন বলে উঠল—'কেন, বন-মুর্গা লাগালে কেমন হয় ?'

আমি বললেম—'মুর্গার লড়াই বাধাতে চাও নাকি ?'

—'ধান দুর্বা হলে কেমন হয় ?'

—'তেলে-জলে হয় আর-কি। গুলমুর্গার সঙ্গে একমাত্র মিলতে পারে কিঞ্চিৎ নুন সুর্বা।'

অনাটন বলে উঠল—'আর কুল-ফুট্টা।'

অবিন—'ব্যোম কালী কলকত্তাওয়ালী'—বলে এক থাবড়া বসিয়ে দিলে অনাটনের পিঠে। আমি লাফিয়ে উঠলেম।

অবিন বললে—'নাচবে নাকি?'

—'নাচ নয় ভাই, পিঠের 'পর দিয়ে সড়াৎ করে কি যেন একটা চলে গেল।'

—'কাটেনি তো?'

—'না।'

—'চল খিমার মধ্যে, বাইরে আর নয়!'

দেখলেম আগে অনাটন, পিছে পিলে-গোবিন্দ বালির উপর দিয়ে ছুটেছে—ঢাকের কাঠিতে তাড়া করেছে যেন ঢাক!

দূরে অন্ধকারে একটা হাতলণ্ঠন লাল হচ্ছে নীল হচ্ছে। অন্ধকার থেকে যেন ক্রমাগত বলছে—'ওধারে নয়, এধারে আয়!'

আমরা ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে শকুন্ত দুষ্মন্ত বলে গেলেম।

একে মরুভূঁই, তায় সুর্মা-কাজল রাত। অবিন বললে—'ভয় লাগছে নাকি?'

—'নাঃ।'

—'শীত লাগছে না?'

—'উঁহুঃ লাগছে ভালো হে।'

অবিনের মন তখন খিমা খুঁজছে। আমাকে নড়াবার জন্যে বললে—'হিমে মাঠে ঘোরা আমার সহে গেছে, কিন্তু তোমার ধাতে সইবে না।'

আমি দুষ্টুমি শুরু করলেম কবিত্ব করে—'আহা কী শোভা দেখ দেখি—সামনে অপার প্রান্তর, গভীর নিদ্রার মতো নিথর আকাশ মাথার উপর নীল চাঁদোয়া টেনেছে। মনে হয় যেন সারা জীবন এইখানে অনন্ত এই পথের মুখে ঐ পেঁপেগাছটার মতো—'

অবিন একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিলে। আমি বলেই চললেম—

'আর এই উলুবনের চামর ঘাসের উপরে যদি মাথা তুলতো একখানি কুটির—'

অবিনের গলা-খাঁকানি। আমি বলেই চলেছি—'আর সেই কুটির থেকে থেকে-থেকে কেউ যদি পাঠাতো বাতাসে রাখালী বাঁশির সুরের মতো মিষ্টি গলায় একটিমাত্র ঘুমপাড়ানি গান!'

অবিনের চোখ ছলছল। আর তাকে ভোগাতে সাহস হল না, বললেম—'চল এইবার কোথায় তোমার খিমা।'

গুম্ হয়ে অবিন আগে-আগে চললো, আমি পিছে-পিছে। দূরে দেখা গেল খিমা। ছেঁড়া সতরঞ্চি তিরপল বাঁশ দড়ি একের উপরে প্যাকবাক্স ঝুড়ি ইত্যাদির একটা স্তূপ, সামনে একটা বাঁশে বাঁধা হারিকেন লণ্ঠন, কালি-পড়া তার চিমনি; আলোটা যেন কাজলের মাঝে সিঁদুরের ফোঁটা, প্রজাপতির ছেঁড়া ডানা। সেই আলোতে দেখা গেল পিলে-গোবিন্দকে—দুই হাতে দুই কান ঢেকে উবু হয়ে বসে। সামনে খাড়া বিস্ময়ের চিহ্ন অনাটন।

—'কি রে তোর আবার কি হল?'

উত্তর নেই।

অনাটন বললে—'ওর কান খারাপ হয়ে গেছে, শুনতে পাচ্ছে না।'

—'সে কি এই তো বেশ শুনছিল।'

গোবিন্দ আমার মুখের দিকে চেয়ে কুঁতিয়ে বললে—'মোহনবাবুকে বলুন একটু বাউকমি ওষুধ!'

—'কোথায় মোহনবাবু, কোথায় ওষুধ বাউকমি!'

ঠিক এই সময়ে খিমার মধ্যে একটা সিংহগর্জন!

দুহাত পিছিয়ে পড়ে বললুম—'কিও?'

অনাটন বললে—'খাতাঞ্চিমশায় ঘুমচ্ছেন।'

—'উনি এলেন কখন?'

—'কিছুক্ষণ হল। এসেই গোবিন্দর কান মুচড়ে দিয়েছেন।'

গোবিন্দ অস্ফুটস্বরে—'ওষুধ'—বলেই ভুঁয়ে শুয়ে পড়লো। এমন

সময় খিমার মধ্য থেকে ভারি গলায় উত্তর এলো—'ওষুধ কী হবে! একবার তো হয়েছে।'

গোবিন্দ আর কথা কইলে না, ইসারায় জানালে—'কানে একটু বাউকামি।'

ওষুধ কোথায় পাই? অনাটনকে বললেম—'চায়ের চিনি আছে?'

সে এবারে মান্দ্রাজীতে নয়, সাদা বাংলাতে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, আছে।

—'তাই একটু, আর পানে দেবার চুনের গুঁড়ো দাও একটু খাইয়ে। রাতটা তো কাটুক, সকালে চিকিৎসার চেষ্টা দেখা যাবে।'

খিমার মধ্যে তিনটে কম্বলের বিছানা—তার একটাতে চাদর-মুড়ি একটা ঘড়-ঘড় শব্দ। খালি দুটো বিছানায় অবিন আর আমি শুয়ে পড়লেম।

অবিন একবার বললে—'গোবিন্দটার উপায়?'

আমি সহজভাবেই বললেম—'এখানে তো ডাক্তার বদ্যি মিলবে না, কাল হাকিম খুঁজে আনা যাবে কোনো বেদুইনের আড্ডা থেকে।'

—'তাই ভালো।' বলে অবিন নাক ডাকালে।

আমি জেগে আছি। দূরে একটা ফেউ ডাক দিতে দিতে চলে গেল।

অবিনকে ঠেলা দিয়ে বললেম—'শুনচো? বাঘ আছে! হুঁ!'

তারপর ঠিক খিমার পিছন দিয়ে ছোট-ছোট একদল ঘোড়া কি কি যেন ছুটে পালালো।

খট্ খট্ খট্ খট্—প্রায় দশ মিনিট এইভাবে খটাখট্ শব্দ চললো। অবিন পাশ ফিরে বলে—'হরিণের পাল দৌড়চ্ছে।' এবারে যে-বাগে গোবিন্দ শুয়েছিল সেইদিক থেকে ডাক এলো—'ফেউঃ!' আস্তে আস্তে খিমার কানাত একটু ফাঁক করে দেখলেম—দুটো লাল চোখ অন্ধকারে জ্বলছে।

অবিন চুপি চুপি ডাকলে—'সরে এস।'

আমি কানাত আরো একটু ফাঁক করে গলা বাড়াতেই ভক্ করে বিড়ির গন্ধ আর অনাটন আর গোবিন্দর নাকের ডগাহুটি হল প্রকাশ। সেই সময় খিমার মধ্যে শব্দ হল—'ফেউঃ!'

আমার হাত পা হিম হয়ে গেল। কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁপছি ঠিক এই সময়—'ফেউ ইস্‌চাময়ী তোমারই ইস্‌চে'—বলে খাতাঞ্চিমশায় তিনটে তুড়ি দিয়ে ঘুমের ঝোঁকে ডাকলেন—'সোনাতন!'

পিলে-গোবিন্দ একটা কান-ঢাকা টুপি মাথায় হাজির। খাতাঞ্চি-মশায় তাকে দেখেই চটে উঠে বললেন—'তোকে কে ডাকছে? সোনাতন কোথায়? এ টুপি কার—নিশ্চয় চুরি করেছে পাজি হতভাগা ইস্টুপিড—' ঝড় বহেই চললো।

ইতিমধ্যে অনাটন ইচ্ছাময়ী বড়ি আর জল ঘটি আর ফর্সি হাতে প্রবেশ করলে খাতাঞ্চিমশায় একেবারে ঠাণ্ডা—একটা বড়ি মুখে ফেলে বললেন—'বাবুদের জাগাও।' বলেই তামাক টানতে থাকলেন।

চিৎপাত হয়ে নিদ্রা দিচ্ছি, অনাটন আমাদের কাছে এসে বললে—'বড়িহুটো খেয়ে নেন, সকাল হল।'

আমি চললেম—'চা?'

—'আসছে।'

বলেই অনাটন অদৃশ্য। খাতাঞ্চিমশায়ের ডাক পৌঁছলো—'ওহে উঠে পড়।—ইস্‌চাময়ী তোমারই কির্‌পা!'

সকালে উঠে দেখি খাতাঞ্চিমশায় বসে বসে তাঁর অ্যালার্ম ক্লকটায় দম দিচ্ছেন।

এই ঘড়িটার বয়স তখন ছ-মাস; সোনাতন বুড়ো ঘড়িটার অন্নপ্রাশন দেবার দরবার করতে আমাকে ধরে বললে—'ছোটবাবু মশায়, ঘড়িটার বয়স ছ-মাস পেরিয়ে যায়, ওর একটা নাম হল না? ও তো আমাদেরই একজন সাথী—ঘুম ভাঙায়, কটা বাজলো বলে
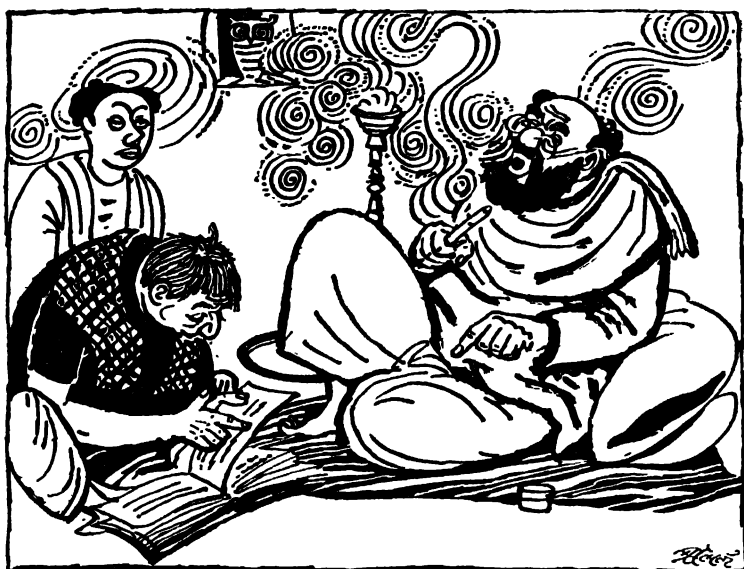
দেয়, কটা বেজে কত মিনিট হল হিসেব রাখছে। ওর অন্নপ্রাশন না হলে চলে কি? বলেন তো!'

আমি বললেম—'ঠিক তো, শুভদিন দেখে ওকে ভাত খাওয়ানো যাবে।'

আঙুটি পাঙুটি, ছেলে বুড়ো সবাই আমরা এই আয়োজনে মেতে আছি, অভিধান খুঁজে নামও একটা বার করেছি, এমন সময় কে জানে কেমন করে বাতাসে বাতাসে খবর পেয়ে গেলেন খাতাঞ্চি-মশায়। সেই থেকে ঘড়িটা বন্ধ হল বাক্সে। কেবল দম নিতে পেতো দিনে একবার করে বাইরের আলো হাওয়া বেচারা! খিমার মাঝে খাতাঞ্চিমশায়কে ঘড়িতে দম দিতে দেখে বললেম—'ভড়কাকে সঙ্গে এনেছেন দেখছি।'

খাতাঞ্চিমশায় বললেন—'ও এখন "ভড়কা" নেই, ওর নতুন নাম দিয়ে গেছে সোনাতোন—"তড়কাবতী"। থেকে থেকে তড়কা রোগে ধরে ওটাকে। সেনগুপ্তর তেল মালিশ করতে হয় রোজ এক আউন্স—তবে ঠিক থাকে।'

আমি বললেম—'ওকে আপনি যে-প্রকার বন্ধ-সন্ধের মধ্যে রাখেন, বাতাস রোদ আলো পায় না, কাজেই তড়কা-রোগে ধরেছে। বড় হয়ে ওর দাঁত পড়লো, তবু ওকে তুলো মুড়ে রাখা কেন? আমি শুনেছি কাল রাতেও ওর দুবার ফিট হবার জোগাড় হয়েছিল।'

—'নাকি?' বলেই রায় মশায় তড়কাকে বাক্সে বন্ধ করে বললেন—'ওর বন্ধ থাকাই অভ্যেস হয়ে গেছে। এই মেঠো হাওয়ায় বার করে রাখলে সর্দি, কাশি, হাঁপানি, নিউমোনিয়া এমনকি হার্ট-ফেলও হতে পারে। এ মরুভুঁয়ে কি ডাক্তার বদ্যি আছে যে ওকে সারিয়ে নেব?'

ডাক্তার বদ্যির কথায় গোবিন্দর কানের কথা মনে পড়ে গেল। বাইরে গিয়ে দেখি, চিনিকেমির গুণে সে চাঙা হয়ে গেছে—মুখে একগাল হাসি। শুধোলেম—'কানে বেদনা আছে?'

—'একটু একটু।'

—'ঠাণ্ডা লাগিও না।' বলে অবিন তার কান-ঢাকা টুপিটা গোবিন্দকে দিয়ে ফেললে।

আমি একটা সিকি দিয়ে বললেম—'আজ গরম গরম ফুলুরি আর—'

—'ফুলই নেই এখানে, বলেন ফুলুরি!' বলে সিকিটা সে ট্যাঁকে গুঁজলে।

এই সময় খাতাঞ্চিমশায়—'ইস্‌চামই, তোমারই কির্‌পা'—বলে খিমার বাইরে এলেন।

—'বখসিস হয়ে গেছে বুঝি?'

গোবিন্দ দে-চম্পট!

—'কী বলছিল হে পাজিটা? ফুল নেই, ফুলুরি নেই? ও জানে না হাত নিসপিস করলে কান মলার জন্যেই ওকে রাখা—ফুলুরির খোঁজে আছেন! ওকে অধিক আদর দিও না, বিগড়ে যাবে। একটু শরীর চাঙা বোধ হচ্ছে, বেড়িয়ে আসি চল। এসে চা খাওয়া যাবে। —ইস্‌চামই—'

বলেই খাতাঞ্চিমশায় অগ্রসর হলেন।

ইচ্ছাবড়ির গুণেই হোক বা চায়ের খোমারিতেই হোক তেজে চললেম আমরা বালির ঢেউ ঠেলে জাহাজের পিছনে তুটো জালি-বোট যেন।

প্রায় ক্রোশখানিক পাড়ি দেবার পর আমি আর অবিন বসে পড়লেম। খাতাঞ্চিমশায় হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন সোজা।

সকালে আকাশটায় তখন হালকা চা-পানির রং ধরেছে। মাথার উপর দিয়ে একটা চাতক পাখি চা চা করে ডেকে গেল। অবিন বললে—'ইচ্ছাবড়ি তো খেলেম, কিন্তু ইস্‌চাময়ীর কির্‌পা তো হল না। এক পেয়ালা করে চা যদি তিনি পাঠাতেন তো উপকার হত।'

বলতে-বলতেই এক মঙ্গোলিয়ান—'ইরেন্দে পাগলা, উরেন্দে পাগলা'—কষে বলে এক বাটি চা অবিনের হাতে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল—টিকিও দেখার সময় দিলে না।

অবিন বাটি দেখে বললে—'এ যে দেখি সোনার হল-করা পোস্ট আপিসের ডুম। কিনারাতে আবার ফার্সিতে কি লেখা রয়েছে।' আমি তখন উর্দু পড়ি, আমার বিদ্যে পরীক্ষা করার জন্যে অবিন বললে—'এ যে হাফেজি গজল, তাজা বেতাজা মনে হচ্ছে লেখা।' বলেই বাটিটা এক চুমুকে শেষ করে আমার হাতে দিয়ে বললে—'পড় তো কেমন পারো!'

আমি বাটিতে চোখ বুলিয়েই বললেম—'এ আর বুঝলে না, একটা রুবাই। এর মানে হচ্ছে—

বাসি লুঙ্গি নাহি ছাড়ে, ধোয় হাত পা,
ভাঙা পিঁড়া ফাটা পাত্রে বসে খায় চা।
নাপিতের ঘরে গিয়া হাজামত করে,
থাকুক অন্যের কথা, ভাগনেও ভাত মারে।'

অবিন বলে উঠলো—'এঃ, আমরা খাতাঞ্চিমশায়ের ভাগনে—এর সবগুলোই যে আমি করি!'

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

—'যেন দশদিন দাড়ি কামাই নি এমনি বোধ হচ্ছে—' গালে হাত দিয়ে অবিনই বলে উঠলো।

আমি পড়ে চললেম—

'পাঁও পরে পাঁও দিয়া বসে যেই জন
তার কাছে ভাগ্যদেবী না যান কখন।'

অবিন বলে উঠলো—'বাজে কথা। এই তো পায়ের 'পরে পা দিয়ে এখানে বসে আছি, আগেও ছিলেম ; চা তো এসে গেল তবু। পিঁড়েতে পায়ের 'পরে পা রেখে বসে বিয়ে করে গৃহলক্ষ্মীলাভ হয়েছিল, এখনও আসন-পিঁড়ি হওয়ামাত্র পঞ্চাশ ব্যান্নন না এসে পারে না—সব গাঁজখুরি!'

আমি বললেম—'সকাল হল, খেউরি হয়ে নিতে পারলে হত।'

ঠিক এই সময় এসে হাজির এক হাজাম কাস্তের মতো অস্তরা আর ইস্ত্রাপ নিয়ে ক্ষুরে শান দিতে দিতে, যেন আরব্য উপন্যাসের বক্‌বক্ হাজাবক্ ইত্যাদি সাত ভাই নাপিতের একজন। সামনে এসেই সে অবিনের ও আমার আধখানা করে মাথার চুল চেঁচে নিয়ে তিনবর্ণের ছবিখানার মতো ঝড়ে উড়ে চলে গেল।

চায়ের বাটিটা নিজের মাথায় টুপি করে বসে আছি, অবিন মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—'ভাই রে, এখন উপায়?'

আমার বাকরোধ!

চায়ের রং ফিকে হয়ে ঠিক ন্যাড়া মাথার বর্ণ ধরলে আকাশ। ঠিক এই সময় দেখি খাতাঞ্চিমশায় দৌড়তে দৌড়তে আসছেন একটা ছিকলের আগায় কুকুরের বকলস টানতে টানতে—কুকুর নেই। গায়ে খিরকা, মাথায় কলন্দরী টোপ চটের থলির মতো হাওয়াতে পিঠের 'পরে লটপট করছে!

আমাদের দেখেই থমকে বললেন—'এই যে তোমরা—এ কী বেশ?'

আমি বললেম—'আপনার এ কী ?'

খাতাঞ্চিমশায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—'শোনো, হোস্বাম জাদুগিরের পাল্লায় পড়েছিলেম। ব্যাটা পোষ-কুত্তো বানিয়েছিল আর কী! ভাগ্যে সঙ্গে ছিল ইচ্ছাবড়ি, গালে ফেলতেই প্রায় পূর্ববৎ—কেবল রইল বকলস আর ছিকলি। কোমরবন্ধ করব বলে নিয়ে এলেম।'

আমি বললেম—'আর এ খির্কা ও টুপি ?'

—'এ দুটো ফেলে আসার সময় হয়নি। কাজেই দেখছো আপাদমস্তক কলন্দর।'

অবিন বললে—'আর আমরা হাজামের হাতে পড়ে আধ-কপালে খণ্ড-ত বনে গেলাম. তার উপায় ?'

—'হাজামের হাতে পুরো মাথাটা যে যায়নি সেজন্যে ধন্যবাদ দাও ইচ্ছামইকে। কিছু খেয়েচো ?'

—'চা।'

—'পেলে কেমনে ?'

—'মঙ্গোলিয়ান দিয়ে গেল।'

—'ওঃ বুঝেছি, চল চল। আর কথা নয়, দৌড় দাও !'

দৌড়োতে যাই, পা ওঠে না। হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে হাঁপিয়ে পড়ে। পাশ দিয়ে আকাশ মাঠ ময়দান দৌড়তে থাকে—আমি যেন ছিকল-বাঁধা।

হঠাৎ খিমার অন্ধকার ঘিরে নিলে আমায় কি রাত্রির অন্ধকার তা বুঝলেন না। নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে দেখতে থাকলেম। কানে পৌঁছলো একবার—'ইস্‌চামই, তোমারই কির্‌পা—অনাটন !' তড়কা ঘড়ির খুট্‌খুট্ শব্দ পেতে থাকলেম। বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে শুনি, রাতটা যেন সদ্য-ফোটা মুরগির বাচ্চার মতো বলে চলেছে—'ইতি ইতি ইতি !'

——

ভবের হাটে হেতি হোতি

প্রজাপতি সৃষ্টির গোঁসাই,
সৃজন করলেন দুটি ভাই।
হেতি হোতি গোল গাল,
একটি কালো একটি লাল॥

সৃষ্টির প্রথম দিনে পৃথিবীতে জীবের খাদ্য কিছু ছিল না। তারা পরস্পরকে ধরে খেতে শুরু করেছিল। হেতি হোতি দুই ভাইও যখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে কঃক্ষাম—কিংখাম—ক্ষুৎখাম বলে চিৎকার করতে করতে এ-ওকে খেয়ে ফেলবার উপক্রম করেছে, সেই সময় জগৎ গোঁসাই এসে তাদের হুকুম দিলেন—'তোমরা ভবের হাটে ঘোল খেতে যাও।'

জগৎ গোঁসাইয়ের হুকুম-মতো হেতি হোতি ভবের হাটে ঘোল খেতে রামায়ণের তিনশো বত্রিশ পাতা ছেড়ে বার হল যেন দুটি গুটিপোকা!

ক্ষুধাতে আকুল তনু ঘন বহে শ্বাস।
চলেছে ভবের হাটে ঘোল খেতে আশ॥

তেপান্তরের মাঠে ওৎ পেতেছে রোদ। চলেছে তো চলেইছে দুটি রাখাল—হেতি হোতি অবোধ। রাতে শীত দিনে গ্রীষ্মি করায় বোধ অলজ্ঘ্যাচরের খর বাতাস!

সেই অলজ্ঘ্যাচরের কথা কিবা জানাই,
যোজনের পর যোজন চাই,
নীর-ক্ষীর দেখা নাই

বাড়ি নাই ঘর নাই তথা মানুষ-মুনিষ
সে চরের ফেরে পড়লে পরে হারাই হদিশ!
পুরব পশ্চিম কোথা বা যাই,
উত্তুর দক্ষিণ চেনারও জো নাই!

চলেছে তো চলেইছে হেতি হোতি দুই রাখাল পাঁচনি হাতে চরের পর দে—চলতে চলতে ভুলে গেছে তারা—কোথা থেকে এসেছে, কোথায় বা ছিল—তিনশো বত্রিশখানি পাতা চাপা লাল কালো দুটি জীব্-জীব্ পোকা যেন! শুধু মনে আছে ভবের হাটে ঘোল খেতে চলেছে।

তখন রোদ সরে-সরে, আবার দেখা যায় ওপার-চরে। এমন সময় ত্রিসত্য বাবাজী দেখা দিলেন। এক হাতে লাঠি, এক হাতে লণ্ঠন, আগে আগে ত্রেতাযুগের তে-রঙা একটি গাভী, তার ট্যারা-ব্যাঁকা শিং, ট্যারচা দুটো চোখ, চ্যাপটা কপালে আর-একটা চোখের মতো টিপ। গাভীটার তিনটে পা ভালো, একটা পা খোঁড়া; টঙস্ টঙস্ করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসছে, তিন পা চলছে আবার এক পা দাঁড়িয়ে হাঁপ নিচ্ছে।

ত্রিসত্য বাবাজী হেতি হোতিকে দেখে বললেন—'বাপধনেরা, ঘুরতে-ফিরতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

হেতি হোতি বললে—'যেতেচি ঘোল খেতে ভবের হাটে, পথ তো দেখতেছি অফুর! ভবের হাট কে জানে কদ্দুর?'

ত্রিসত্য বাবাজী বললেন—'ভবের হাট তো আর একটুখানি নয়, কত কাগার হাট, বগার হাট, বাগের হাট, মগরা হাট, মুরগি হাট, চিংড়ি হাট, মেছো হাট—এমনি হাট বেহাট নিয়ে বিরাট একটি ব্যাপারকে কয়—ভবের হাট! শুধাও এই গাভীটারে যদি বিশ্বাস না হয়। আমার এই গরুটি তোমাদের দিলেম! এর সঙ্গে সঙ্গে চলে যাও চক্ষু বুজে। ভবের হাটে কোন্ দিকে কী এই গরু সব চেনে।

—'সইত্য—সইত্য—সইত্য, ভবের হাটে সইত্য পথ দেখাবার এই গরুই হলেন গুরু অদ্বৈত'—বলেই ত্রিসত্য বাবাজী গায়েব।

রোদটা এতক্ষণ মাঠে ওৎ পেতে বসে ছিল, চট্ করে বাবাজীকে গিলে সট্ সরে গেল। ত্রিসত্য বাবাজী সত্য না অসত্য কিছুই বুঝতে দিলে না।

তিনবার হাম্বারব দিয়ে ত্রিসত্য বাবাজীর তে-রঙা গাভীটি মাঠে মাঠে ঘাস খেতে খেতে আগালে। পায় পায় যেদিকে যায় গাভী, সেদিকে যায় হেতি হোতি ঘুঁটে কুড়ুতে কুড়ুতে। গরু তিন পা চলে এক পা দাঁড়ায়। হেতি হোতিও দাঁড়িয়ে দেখে, গরু মাটির কাছে মুখটি নামাচ্ছে আর মাটি ফুঁড়ে ঘাস উঠে আসছে তার মুখে। এই না দেখে হেতি বলে হোতিকে—'আয় না ভাই, আমরাও অমনি করে ঘাস খাই।'

কিন্তু মাটিতে মুখ ঠেকাতেই খুদি পিঁপড়ে দেয় নাকে কামড়। ঘাস খাওয়া আর হয় না তুজনার। নাকে আসে ভিজে মাটির ভুরভুরে গন্ধ, মুখে কিন্তু কিছুই আসে না। মাঠের পারে ছোট নদীটি হেতি হোতির এই ঘাস খাওয়া দেখে খিল্ খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে— 'তোরা কি গরু যে ঘাস খাবি ? আয় আমার কাছে, জল খাবি আয়।'

গরু আগে নামে জলে। মুখ নামিয়ে জলের মধ্যে জল খায় চক্ চক্ করে। তারপর ঘাসে জলে একপেট ভর্তি হলে বলে—'বাঃ!'

হেতি হোতি গরুর দেখাদেখি তেমনি করে জলের ভিতর মুখ ডুবিয়ে জল খেতে যায়, নাকে মুখে ঢুকে পড়ে জল কলকল করে। হেঁচে কেসে উঠে পড়ে হেতি হোতি ডাঙায়। হেতি বলে হোতিকে— 'তুত্তোর, আমরা কি গরু যে জল খাবো ?'

হোতি বলে—'ঐ ত্থাখো কাদাখোঁচা—কেমন মজা করে কাদা খুঁচে খাচ্ছে। ওরও তু-পা, আমাদেরও তু-পা।' এই বলে তুজনে তু-থাবা কাদা তুলে নিয়ে মুখে ভরে দিলে। কাদার সঙ্গে তু-দশ কুড়ি ঘুসো চিংড়ি চলে গেল তাদের পেটে। গরু তেরচা চোখে হেতি হোতির দিকে চেয়ে বললে—'এরে বলে চিংড়িহাটার ঘোল। রাতের মতো পেট ভরে খেয়ে নাও।' এই বলে চক্ষু বুঁজে ঘুমোয় আর ন্যাজ নাড়ে গরু।

হেতি হোতি পেট ভরে কাদা চিংড়ি খেয়ে গলা ছাড়লে রাখালী সুরে জলের ধারে বসে—

'জন্মালাম যদি হলাম না কেন গরু
আমরা তুটি ভাই হেতি হোতি
চব্ চব্ ঘাস খেতাম চক্ চক্ জল খেতাম চরতি-চরতি !
সুখে রইতাম ঘাসে জলে ভর্তি !
তা না ঝকমারির বেগার ধরতি—
হলাম রাখাল, পেটটি বড়, বুদ্ধি মোটা অতি,
হাত পা সরু সরু, ও ভাই গরু, আমরা হেতি হোতি !'

জগৎ গোঁসাইয়ের ছোট ভাই জীবন গোঁসাই কুম্ভক করে বসে ছিলেন জলের মধ্যে। হেতি হোতির বিকট গলার গান শুনে জল ছেড়ে উঠে এলেন—ঠিক যেন বিরাট-কলেবর ডিমওয়ালা এক তপসি মাছ! সর্বাঙ্গ তেলে জলে পিছল। লালচে কটা রঙের একঝুড়ি দাড়ি গোঁফ। থেকে থেকে তিনি খাবি খান আর নাচেন গান—

'জীব-মীনের এবার জীবন গেল
বুঝি কাল বুঝে কাল ধীবর অ্যালো!
জীবনের জীবন নিতে
টানা জাল, কুঁড়ো জাল আর বেড়া জালে—
বুঝি প্রাণ রাঘব-বোয়ালে ঘেরে ফ্যেলো!
গভীর জলের তপসি মাছ, খেয়ে বড়শি খ্যাঁচ্
জল ছেড়ে জমির 'পরে পট্‌কান খ্যেলো!
আশা-টোপ গিলে বাতাসে, তিনটা ডিগবাজি খ্যালো।
আর তিনটা খ্যাবি খ্যেলো।'—

হঠাৎ হেতি হোতিকে জলের ধারে বসে থাকতে দেখে ধীবর মনে করে জীবন গোঁসাই আড়াই পাক ঘুরে ডিগবাজি খেয়ে কোমর জলে লাফিয়ে পড়ে হেতি হোতির দিকে চেয়ে আবার গীত গাইতে শুরু করলেন—

'কত কুদ্‌রৎ জানোরে কর্তা কত কুদ্‌রৎ জানো
গভীর জলে ফেইলা জাল ডাঙায় বৈসে টানো!
তোমার ছিপের আগায় বঁড়শি, সুতায় বাঁধা ফত্তা
মাছের হাটটা কোথায় জানো—জীব-জগৎ কর্তা!'

গানের শেষে বললেন—'চতুরানন প্রজাপতিকে শত-শত প্রণিপাত! কে বাবা তোমরা দুটি, কোন্ কাজে জলের ধারে কাটাতে বসলে রাত?'

—'আজ্ঞে আমরা হেতি হোতি, ভবের হাটে ঘোল খেতে চলেছি সম্প্রতি।'

জীবন গোঁসাই বললেন—'বেশ, নজর রেখো দেহের পুষ্টির প্রতি।

জীব-জীবন রক্ষার তরেই জন্ম যখন, তখন নাও এই ঘোল খাবার খুদে ঘটিটি। বুঝেছি তোমরা ভবের হাটে যেতেছো, কিন্তু সে তো সহজে হচ্ছে না! এর জন্য জগমুনশির ছাড়-পত্র চাই দুখানি।'

হেতি হোতি বললে—'তিনি কোন্‌দিকে থাকেন?'

—'জগমোহনের কাছারিতে গেলেই তাঁকে পাবে। এই জলের ধার দিয়ে চলে যাও সিধে।' বলে জীবন গোঁসাই মাছের আঁশে লেখা একটুকরো চিঠি মুনশির নামে হেতি হোতিকে দিয়ে ঝম্পটি ঝপাং করে জলের মধ্যে হলেন অদৃশ্য।

তিন পহর রাতে জগমুনশির কাছারির খোঁজে চললো হেতি হোতি খোঁড়া গরুটি তাড়িয়ে। আকাশে দেখা যাচ্ছে—

আঁধার 'পরে চাঁদের কলা, কতক কালো কতক ধলা
উত্তরে উঁচা—দক্ষিণে কাত মেঘ দু-খানা বিরাট;
তারা কোন্ দেশ হতে আসছে কোন্ দেশে বা যাচ্ছে
কিছুই যায় না বলা!

যেতে যেতে যখন—

পোহায়ও বটে, পোহায় না রাত
হয়ও বটে হয় না প্রভাত,

সেই সময় দেখা গেল জগমোহনের কাছারি—

পোড়া বাঙলাটা—ওড়া ছাত উত্তরে উঁচা—দক্ষিণে কাত;
বাগানে খালি শেয়াল-কাঁটা আর দেদার মানকচু পাত।

জগমুনশি একটি তুষকাঠের তেপায়ার 'পরে বসে ওয়াস্তির কলম কাড়ছেন, আর আপন মনেই গাইছেন—

'সংসার কোষের কীট,
সঙ্কটে দেখবে সম্মুখে এবার—
বিষয় তুঁতের পাতে রসাস্বাদে গোলাকার
বাঁধলে ঘর সোনার সুতার

ও সেই ঘরের ছুতায় বাঁধবে তোমায় কালের দুত
সে এক ঘটবে ব্যাপার কী অদ্ভুত !
রেশমের ব্যবসাদার !
এখন আছ বদ্ধ কোষে মনের খোশে
না ভাবিছ শেষের ব্যাপার !
হায়রে তুন্দুরে রেখে যেদিন ভাপ দেবে—
সেদিন কী কষ্টে প্রাণ যাবে তোমার !
তাই বলি তোমায়—
কাটি কোষের সুতা বাড়াও ত্বরায়,
ভালো যদি চাও আপনার।
নতুবা বিপদ ভারি, দেখ বিচারি—
ঘরই শত্রু হইল তোমার !'

এই সময় হেতি হোতির খোঁড়া গরু কাছারির হাতার মধ্যে ঢুকে কচুপাতা চিবুতে থাকলো। জগমুনশি হাঁকলেন—'ও পানি-পাঁড়ে, কাছারির কচুগাছ খায়, গরুটাকে বাঁধো।'

হেতি হোতি বুঝলে জগমুনশির কাছারিতে এসেছি। হোতি হোতিকে দেখে জগমুনশি কানে কলমটা গুঁজে চাকুখানা বাগিয়ে বললেন—'ক্যে ?'

—'আজ্ঞে আমরা হেতি হোতি।'

মুনশি বললেন—'হেতি হোতি বলে কাউকে তো চিনি না বাপু ! চিঠি এনেছ কি কারুর ?'

হেতি হোতি জীবন গোঁসাইএর দেওয়া মাছের আঁশখানি জগমুনশির হাতে দিতেই মুনশি সেটার 'পরে একবার চোখ বুলিয়েই বললেন—'ভবের হাটে ঘোল খেতে যাবা ? ও পানি-পাঁড়ে, একখানা ছাড়পত্র লিখে ফ্যালাও তো। বোসো বাবাছুটি, একটু দেরি হবে। গরুটা বেঁধে আসুক জলধর পাঁড়ে। ছাড়পত্র দিলেই তো হল না ! আগে বয়নামা, তারপর ছোলেনামা, বকলম দস্তখৎ, পাঞ্জা মোহর পড়ল, তবে হল পাকা আঁচড়-দোরস্ত ছাড়পত্র। তোমরা তো রাখাল,

যাও দেখি গাইটা দুয়ে একটু দুগ্ধ আনো তো ? দেখি কেমন চতুর তুই ভাই ! সকালে দুগ্ধ না হলে চলে না। হাতের লেখা বিগড়ে যায়।'

হেতি হোতির দিকে চায়। হোতি হেতির দিকে চায়। আর দুজনকে দুজনেই বলে—'দুগ্ধ !' জগমুনশি ওদের ভাবগতিকে বুঝলেন, দুগ্ধ কারে বলে ওরা জানে না।

ধমকে বললেন—'দুগ্ধ চেনো না, কেমন রাখাল তোমরা ? গাভী দোহন করলেই দুগ্ধ পাওয়া যায় তা তো জানো, না তা-ও জানো না ? গাভী দোহন কেমন করে করতে হয় তা—'

এমন সময় পানি-পাঁড়ে এসে হাজির হতেই জগমুনশি বললেন —'ও জলধর ! এরা যে গো-দোহন কারে বলে জানে না, দুগ্ধ চেনে না, কত দুধে কত জল তার জ্ঞান নেই, অথচ ভবের হাটে ঘোল খেতে যাবার ছাড়পত্র চায় ! হঠাৎ ভবের হাটে গেলে তো মুস্কিলে পড়বে ! ঠকে যাবে, ঠেকে যাবে একদম !'

জলধর পাঁড়ে বললে—'এদের এখন ছাড়পত্র দেওয়া চলে না। আম্বিবুড়ির ওখানে কিছুদিন বেগার খেটে আসুক তবে ছাড়পত্র দেওয়া যাবে।'

হেতি হোতি কাতর ভাবে বললে—'গরুটি ছেড়ে দিন, আমরা চলে চাই।'

জগমুনশি বললে—'যাই বলতে নেই, বলো—আসি, আবার দেখা হবে।' বলেই জগমুনশি গুন-গুন সুরে গান ধরলেন—

'বিদায়, বিদায়, বিদায়-বেলা দায় দোষ সব মাপ,
দায়ে-আদায়ে দেখা হয় ভালো না-হয় ভালো সাফ !
খুশি হালে বেহাল তবিয়তে, বিদায় চাই পেতে হাত—
সুখে যেন যায় দিনরাত।'

পানি-পাঁড়ে জলধর বললে—'গরু দুধের ভারে তেজে চলতে পারবে না। চলো, দুধটুকু দুয়ে নিতে শিখিয়ে দিই। দুধের ভার হালকা করে গরু নিয়ে চলে যাও—হেই সে আম্বিবুড়ির খোঁয়াড়ে।'

জলধর পাঁড়ের কাছে দুধ দোয়া শিখে কতখানি দুধে কতখানি জল জেনে হেতি হোতি খালি পেটে হালকা গাইগরুটি নিয়ে বিদায় হল—আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির খোঁয়াড়ের দিকে। পথে যেতে যেতে তারা ধরলে দুটিতে একটি গীত—

'ওরে গইল-ছাড়া বইল, বিদেশ বিভুঁই বিজন নদী পার
চলমান বেগানা তুই, দীঘমান দিন করলি কাবার।
রাতের তারার চিন্ চিনেও যে চিনছোনা
এবে গোঠে চলোরে থাইবা থইল!

তেরঙা গাভী শিং আর ন্যাজ নেড়ে জানালে—এমনি গোঠে যাবো? সাত ঘাটে জল খাবো, তবে গোঠে যাবো!

কী আর করে—চললো হেতি হোতি ধীরে ধীরে চাঁদপাল ঘাট, তেলকল ঘাট, তক্তা ঘাট, আরমনি ঘাট, কুলপি ঘাট, কয়লা ঘাট শেষ বাবুঘাটে না জল খেয়ে গরু দিলে ছুট—গোধূলিতে!

মাঠ ময়দানে চিত্র-বিচিত্র পদচিহ্ন গোষ্পদ আর শ্রীপদে পদাকীর্ণ করে গিয়ে ঢুকলো হেতি হোতি দুই রাখাল আদ্যিবুড়ির খোঁয়াড়ে খোঁড়া গরু খুঁজতে। সেখানে দেখছে কি হেতি হোতি—

গরু রয়েছে বাথানে, ষাঁড় রয়েছে উঠানে।
দাওয়ায় শুয়ে বাঘ!
মাচানে শুয়ে বানর, আড়াতে পড়া টিয়ে,
মুড়াকে দাঁড়কাক!

খিড়কিতে মুর্গি, হাঁস, খড়ের চালিতে শালিক, ঘুঘু চরে সুপুরি বাগানে। এই বাগানের চারি পার্শ্বে ভীষণ অটব্য, মধ্যে মধ্যে পর্বতমালা ও অতি পুরাকালের স্রোতস্বিনী নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার দেখা যায়। স্থানটির মধ্যে রয়েছে এক ব্যাসকুণ্ড। এই কুণ্ডের যেদিক দিয়ে হোক না কেন মানুষ ঢিল ছুঁড়ে পার করতে পারে না। কুণ্ডের মধ্যস্থানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তেজ বেশি। সেই কুণ্ডের তিন ধারে বসে আদ্যিবুড়ি, মাধ্যিবুড়ি আর অন্তিবুড়ি সুপুরি ফেলা-ফেলি

খেলছিলেন এমন সময় দূরে থেকে হেতি হোতিকে আসতে দেখেই 'মহেঞ্জদাড়ো মহেঞ্জদাড়ো' বলে তিন বুড়ি চিৎকার করতেই বিকটাকার এক্ক দেড়ে ছাগল হেতি হোতিকে ঢুঁসিয়ে বিদায় করবে এমনি ভাব দেখিয়ে প্যাঁচালো শিং বাগিয়ে পায়ে পায়ে এগুতে থাকলো। হেতি হোতি যত পিছোয়, তত আগায় ছাগল।' শেষে বোকা ছাগলটা ছুই পায়ে খাড়া হয়ে যেমন তেড়ে মারবে ঢুঁ অমনি হেতি ধরেছে তার শিংছুটো চেপে, হোতি ধরেছে মুঠিয়ে তার দাড়ি। আর যায় কোথায়! শিং ধরে এক মোচড় আর দাড়ি ধরে এক ঝাঁকানি দিতেই ছাগল ম্যা ম্যা বলে কেঁদে ফেললে—ম্যা অঁ্যা—অম্‌ঁ্যা! বাঘটা দাওয়ায় ঘুমিয়ে ছিল, ছাগলের ম্যাম্‌ঁানি শুনে গাঁ গাঁ করে লাফিয়ে ছাগলের ঘাড়ে পড়ে আর কি! আম্বিবুড়ি এক ধমক—ছাগল ছাড়া পাওয়া, হেতি হোতি কাঁচুমাচু, বাঘ ন্যাজ গুটিয়ে মিউ মিউ করতে করতে চম্পট! আম্বিবুড়ি ব্যাসকুণ্ডুর পাড়ে খেলায় গিয়ে বসলেন, স্থপুরি ফেলা-ফেলি চলল যেমন চলছিল।

—টুপ্‌-টাপ্‌ টিপ্‌-টুপ্‌! এক স্থপুরি টুপ্‌ ছুই স্থপুরি টাপ্‌ তিন স্থপুরি টিপ্‌ টাপ্‌ টুপ্‌! এক টিপ এক টুপ, ছুই টিপ এক টাপ, তিন টিপ এক টুপ! আম্বিবুড়ি বললেন—'কার হার, কার জিত?' মাধ্যিবুড়ি বললেন—'কার জিত কার হার?' অন্তিবুড়ি বলে উঠলেন —'জিত যার হার তার, হার যার জিত তার।'

এখন তিন বুড়ি তুড়ি দিয়ে নাচে আর গায়—

'তাক্‌-তুড়া-তুড়্‌-তুড়া
ভাঙলো খাটের খুরা
ছিঁড়লো তুলোর তোশক।
তিন বুড়ির দেখতে নাচন জুটলো ছুটো লোক।
তাদের নামছুটি কী?
একটি কালো একটি লাল
দেখতে ভালো গোল গাল
কাঁচা স্থপুরি!'

তাক্‌-তুড়া-তুড়্‌-তুড়া শুনে এককুড়ি ছাগলছানা সঙ্গে ছাগলীর মা বুড়ি খাটুর-খুটুর করে এল। হেৃতি হোতির মুখের দিকে চেয়ে বললে —'ক্যে? তোরা ক্যে র‍্যে?'

হেতি হেতি বললে—

'আমরা হেতি হোতি দুই রাখাল
দুইটি প্রাণী হাবা গোবা
মোদের নাইকো পুকুর নাইকো ডোবা
গরুর সনে কাঁটা বনে
ঘুরি ফিরি নিশি দিবা।
ভবের হাটে ঘোল খেতে যাই
জ্ঞান গোচর নাই
কোথায় খানা কোথায় ডোবা।'

আস্তিবুড়ি শুনে বললেন—'ও মাধ্যি! কী করা যায় হেতি হোতিকে নিয়ে?'

মাধ্যি বললেন—'ও অস্তি! কী করা যায়? এদের জ্ঞান গোচর কিছু নেই!'

অস্তি বললেন—'প্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞ জ্ঞানকুণ্ডু আছেন, তাঁর কাছে এদের দুটিকে পাঠিয়ে দাও।'

ছাগলীর মা বুড়ি, এককুড়ি ছাগলছানার মধ্যে থেকে একটি তিনরঙা ছাগল বেছে নিয়ে বললে,—'এইটি নিয়ে যাও, জ্ঞানকুণ্ডুর গুরুদক্ষিণে। দেখ যদি এর বদলে সে জ্ঞানবুদ্ধির হাঁড়া থেকে কিছু দেয় দুজনকে!'

হনুমান-ঝোরার ধারে জ্ঞানকুণ্ডুর বাড়ি—সেখানে মশাল জ্বালিয়ে সানের বাইরে কি ভিতরে ধরলে দপ্‌ করে নিভে যায়। এ-হেন সেই সোঁতা ঘরের মধ্যে জ্ঞানের ঝুড়ি আগলে বসে থাকেন সর্বজ্ঞ জ্ঞানকুণ্ডু গর্দভের চামড়া মুড়ি দিয়ে।

ভুস্‌কুমড়ো ক্ষেতে ঢাকের মতো একটা গোলাঘর। তার না-আছে

দোর না-আছে ঘুলঘুলি। আগাগোড়া আড়ামোড়া ইঁদুরমাটিতে নিকোনো, তার উপর তিনকোনা, চারকোনা, আটকোনা আড়ি-দাঁড়ি-কসিতে টানা চৌষট্টি কলাবিদ্যের রশি; যাদুবিদ্যের, চুরিবিদ্যের, জুয়াচুরি-বিদ্যের নক্সা আর আলপনা।

গোলাঘরে ঢোকবার পথ না পেয়ে হেতি হোতি ডাকলে—'কুণ্ডুমশায় ঘরে আছেন?'

সাড়াশব্দ নেই, ছাগলটা ডাকল—'ব্যে-ব্যা, ব্যে-ব্যা ব্যে এ এ এ!' তিন ডাকের পর গোলাঘরের মধ্যে থেকে শব্দ এল—'পাঁঠা না পাঁঠি?'

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গোলাঘরটার তলা থেকে খানিক ইঁদুর-মাটি ঝরে গিয়ে ছোট্ট একটি ঘুলঘুলি প্রকাশ পেলো। সেইটি দিয়ে কুণ্ডুমশায় মুণ্ডু বার করে হেতি হোতির দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন—'এখানে কেন?'

হেতি হোতি বললে—'এই পাঁঠাটি নিয়ে আমাদের দুজনকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিন!'

জ্ঞানকুণ্ডু বললেন—'আচ্ছা।

যেমন দক্ষিণা দিলা তেমনি বিদ্যা দিব দান
হেতি হোতি দুইজনে শুন ধরি কান—
ক খ গ আদি চৌত্রিশ অক্ষর
ক কা অবধি বারো ফলা, সাঙ্গ অতঃপর—
গুরুকে প্রণাম!'

এইটুকখানি বিদ্যে দিয়ে জ্ঞানকুণ্ডু হেতি হোতিকে বললেন—

'তোমরা সামান্য নহ দুই সহোদর
বিদ্যা চোরাতে এলে আমার গোচর!
মূর্খজন বুধজন আলাপ না করে
এইটুকু বুঝি এবে যাও স্থানান্তরে।'

এই বলেই কুণ্ডুমশায় পাঁঠাটিকে ইঁদুরের গর্ত দিয়ে গোলাঘরের মধ্যে টেনে নিলেন। তার পরেই ঘুলঘুলি বন্ধ। আর কারুর সাড়া-শব্দ নেই।

হেতি বললে—'দাদা, পাঁঠাটা ঠকালে।'

হোতি বললে—'সেইটুকু বুঝলেম কেবল কুণ্ডুমশায়ের কৃপায়। পাঁঠার বদলে কিছু বিদ্যে না হলে এটুকু তো বুঝতেম না!'

হেতি বললে—'তা বটে। চল স্থানান্তরে, কিছুর উপর বুদ্ধি তো খাটানো চাই!'

এই বলে গোলাঘর থেকে কিছু অন্তরে একটা তালবনে গিয়ে বসল দুই ভাই বুদ্ধি খাটাতে। তাল পেড়ে খাবে কোন্ বুদ্ধি করে এই ভাবছে তারা এমন সময়—

রজনী আগত হৈল ঘোর অন্ধকার
ভয় লাগিল অতি হেতি হোতি উভয় জনার।

ওদিকে গোলাঘরে জ্ঞানকুণ্ডু ভাবছেন—ছাগল, গরু, গাধার বদলে, সবাই দেখি বুদ্ধি নিতে আসছে দলে দলে। একটু একটু দিতে দিতে সব বুদ্ধি ফুরিয়ে গেলে কী করবো তখন? এই ভেবে কুণ্ডুমশায় তাঁর ঘটে যা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল একটা মাটির কলসিতে ভরে নিজের গলায় ঝুলিয়ে তালগাছের মাথায় লুকিয়ে রাখতে চললেন। যত বড় না মানুষ ততোধিক বড় কলসি গলায় ঝুলিয়ে কোমরে দড়া বেঁধে তালগাছে উঠা কি সহজ কর্ম! জ্ঞানকুণ্ডু যতবার উঠতে যান গাছে, ততবার পা পিছলে নেমে পড়েন মাটিতে। হেতি হোতি তাঁর কাণ্ড দেখে বলাবলি করছে—'ভাই, লোকটা কী বোকা! গলায় কলসি বেঁধে জলেই ডোবে সবাই। গাছে ওঠে কে?'

কথাটা জ্ঞানকুণ্ডুর কানে পৌঁছতেই থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে, গলা থেকে কলসি নামিয়ে ভাবতে বসলেন—কী করা যায়, কোথায় লুকোই বুদ্ধির ঘট? ঘট বয়ে গাছে ওঠার কী উপায়?

মনের দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন কুণ্ডুমশায়, এমন সময় হেতি হোতি এগিয়ে এসে বললে—'কী ভাবছেন মশায়?'

কুণ্ডু বললেন—'ভাবছি এই কলসিটারে গাছের আগায় কেমনে নেওয়া যায়?'

হেতি হোতি বললে—‘গলায় না ঝুলিয়ে কলসিটারে পিঠের ’পরে নেন! গাছের আগায় সহজে চড়ে যান।’

জ্ঞানকুণ্ডু খানিক হাঁ করে থেকে বললেন—‘অ্যাঁ! সর্বজ্ঞ জ্ঞানকুণ্ডু আমার নাম! আমার ঘটে এইটুকু বুদ্ধি ‘জোগালো না! ধিক্—’ বলেই বুদ্ধির ঘট সেইখানেই ফেলে—‘গলায় দড়ি, গলায় দড়ি’—বলতে বলতে দে-দৌড় জ্ঞানকুণ্ডু।

হেতি হোতি কলসিটা ভেঙে দেখলে তার মধ্যে মৌচাকের মতো একটা কি রয়েছে। তার খোপে খোপে সুবুদ্ধি, কুবুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দুষ্টুবুদ্ধি, শিষ্টবুদ্ধি বিড়-বিড় করছে। দুই ভাই মৌচাকটি দু-ভাগ করে মুখে পুরে দিলে। একটু মিঠে, একটু তিতে, একটু ঝাল, একটু টক, একটু ঠাণ্ডা, একটু গরম লাগলো। বুদ্ধির চাক চিবিয়ে খেতে-খেতেই দু-জনের বুদ্ধি বেড়ে বেড়ে তালগাছ!

কোমর বেঁধে চললো তখন হেতি হোতি দুই ভাই ভবের হাটে ঘোল খেতে।

বুদ্ধির চাক চিবিয়ে খেয়ে জগমুনশির বাড়ি ছাড়পত্র আনবার জন্যে তালতলা দিয়ে চলতে চলতে হেতি বলছে হোতিকে—‘ভাই, মাথাটা কেমন ভারি বোধ হচ্ছে না?’

হোতি বলছে হেতিকে—‘বোধকরি বুদ্ধির ভারে ঘাড় ঝুঁকে পড়ছে। এই গাছতলে বসে নিই আয়। বুদ্ধি একটু পাকুক, তবে এগোনো যাবে জগমুনশির কাছারিতে।’

বোতলের মতো গোড়া মোটা গলা সরু একটা তালগাছ, তার গায়ে বুলু-বেলাক্ একটা ফেলাগ্—তার তলায় লেখা—জ্ঞানকুণ্ডু কালি কুণ্ডু এণ্ড কোং। হেতি হোতি ঘুরে-ঘারে দেখলে বাড়িতে ঢোকবার রাস্তা কোনো দিকে নেই। কী করে, সেই গাছে ঠেস দিয়ে দু-জনে বুদ্ধি পাকাতে বসলো—হেতি আকাশের দিকে চেয়ে, হোতি মাটির দিকে চেয়ে। এমন সময় শুনলে—বোতলি-তালের গাছটার মধ্যে ঘটর ঘটর শব্দ। কালিকুণ্ডু কালি ঘুটছেন—

'কালি ঘোঁটন, কালি ঘোঁটন
নোটন কালি, ঘোঁটন কালি,
সবার দোতের ঘন কালি
আমার দোতে আয়—
কালি ঘোঁটন, কালি ঘোঁটন,
ঘট-ঘটেশ্বরের পায়।'

তার পরেই বুলু-বেলাক্ ফেলাগ্‌খানা পর্দার মতো গুড়িয়ে গেল ; তার মধ্যে থেকে কালিকুণ্ডু দু-হাতে ছোট দু-বোতল লাল কালো কালি হেতি হোতির গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন—'ও কঞ্চি! ও তলতা! তালতলায় হুস্থুর মুস্থুর এসেছেন, ওদের খাতির করে বসাও!'

কঞ্চি আর তলতা কালিকুণ্ডুর দুই মেয়ে—একজন বুলু-বেলাক্, একজন টর্কি-রেড। গাছ বেয়ে নেমে এসে বললে নেচে নেচে গান গেয়ে—

'হুজুর হুজুর
তালপাতার হুস্থুর মুস্থুর বাঁশপাতার থানা
কালকাসুন্দির বনে আছে বাদশাহী বিছানা!'

এই বলে দু-জনে তালপাতার পাখা আর বাঁশপাতার চামর দোলাতে দোলাতে আগে আগে চললো—পাছে পাছে হেতি হোতি গিয়ে ঢুকলো কালকাসুন্দির বনে।

কালকাসুন্দির সবুজ মখমলের মতো পাতার বিছানায় হেতি হোতিকে বসিয়ে কঞ্চি আর তলতা বললে—'আমরা এখন পলতার ঘাটে চললেম। বীডায়। কুটবায়। আই উইস্ গো। কাম ব্যাক নো।'

হেতি হোতির বুদ্ধি তখন পেকেছে। তারাও বললে—'কম্ নো কম্—উইস্ গুট্!'

বলে বিছানায় শুয়ে পড়লো। যেমন শোয়া অমনি ঘুম। যেমন

ঘুম, অমনি নাক ডাকা। যেমন নাক ডাকা, অমনি কাসুন্দির শুন্দি ছাড়া 'কা' বুড়ির খবর পাওয়া।

তখন বাঁশতলায় কা-বুড়ি বলছে—'কা।' তালগাছে কাউয়া বুড়ো বলছে—'ক'! এই চললো খানিক কা-ক ক-কা ককানি ক-বুড়ি আর কাউয়া বুড়োর। তারপর যেমন একবার কাউয়া বুড়ো বলে ফেললে—'কা,' অমনি কা-বুড়ি বলে দিয়েছে—'রাত পোহাইয়া যাঃ!'

বাস্! আর কোথায় আছে, রাত পুইয়ে ফরসা!

অমনি হুক্কা শেয়াল ডাক দিয়েছে—'হুক্ক্যা হুয়া—হুক্ক্যা হুয়া।'

হেতি হোতি বাদশাহী বিছানায় আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসে বললে—'ক্যা হুয়া রে ক্যা হুয়া?'

তখন শেয়াল বলছে—'হুজুর ফরসা হুয়া!' বলেই ফোগলা শেয়াল হোগলা বনে ঢুকতেই—'কোয়াক কুয়া, কোয়াক কুয়া' শব্দ দিলে কা-বুড়ির একজুড়ি পাতিহাঁস।

হেতি হোতি ঘুম থেকে উঠে ভেবে পায় না এ কোথায় এলেম। দু-জনে দু-জনকে চিনতে পারে না। এ ভাবে—ও লোকটা কে! সে ভাবে—ও লোকটাই বা কে!

হেতির মেজাজটা যেন হুজুর হুজুর আর হোতির মেজাজটা যেন মজুর মজুর হয়ে পড়েছে। বাদশাহী বিছানাতে বসে একজন ভাবছে নিজেকে হুজুর-বাদশা, আর একজন ভাবছে আপনাকে মজুর-বাদশা।

কুড়ের বাদশাকে তাঁর উড়ে মালী গিয়ে খবর দিচ্ছে—'ইয়ে কোঁড় আইলা কড়তা! বাদশাহী বিছানা দখড় কড়ি নিলা!'

কুড়ের বাদশার থাকবার মধ্যে ছিল আড়াই হাত হোগলাপাতা ছাওয়া কুড়ে ঘর, কড়ির ছিকেয় বাঁধা গোটাকতক ফুটো ভাঁড় আর ঐ কালকাসুন্দি বনে বাদশাহী বিছানাটি! এই এস্টেট—কালিকুণ্ডুর কা-বুড়িকে বিয়ে করে—একটুখানি শয্যাদান পেয়েছিলেন তিনি। রাতে গড়াতে ছিল তাঁর কুড়েখানি, দিনে গড়াতে ছিল কালকাসুন্দির

বনে বাদশাহী ঐ বিছানাটি। উড়ে মালীর কথায় কুড়ের বাদশা জবাব করলে—'দখল হয়েছে হোক, বে-দখল হয়নি তো, তবু রক্ষে! যাও, চিতাবাড়ি আব ধাঁইকিড়ি দুই সর্দারকে নিয়ে, ভালো মুখে তাঁদের গিয়ে বলো—'দখল ছাড়ো ভালো, নয়তো যুদ্ধ অনিবার্য।'

উড়ে মালী কুড়ের বাদশার দুই সর্দারকে নিয়ে চললো বাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে—

'চিতাবাড়ি ধাঁইকিড়ি
আগবাড়ি সাঁইকিড়ি
ধাঁইকিড়ি আইকিড়ি
ডিঙামাটি ঝিঙাপাড়ি
ঝাঁইকিড়ি ঝনগিড়ি
গুঁসাই বাড়ি!'

ঝালিকুণ্ডুতে আর কালিকুণ্ডুতে চিরকালই ঝগড়া কালকাসুন্দির বনটি নিয়ে। ঝালিকুণ্ডুর সর্দার বেরিয়েছে দেখে কালিকুণ্ডুর তালিপাতের সেপাই তারাও বার হল বুলু-বেলাক্ কালি মেখে, তালপাতার ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়ে রণ্ রণ্ শব্দে—

'ঝম্-ঝমা-ঝম্ ঝিমকিড়ি
দন্তে দিবা ফিটকিড়ি
খন্নি খাবা কিড়মিড়ি
চিকি সুপারি পানবিড়ি
ঢাল তলোয়ার তালপত্র চিড়ি।'

একদিকে তালপাতা—ওদিকে পাকাটি কাটি। যুদ্ধ বলে—'আমি আর কোথায় আছি!' যেন হঠাৎ প্রভাতে মেঘডম্বুরে মহা আড়ম্বরে কোটি পাতা উড়িয়ে একটা মহা ঝড় বহে গেল। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া করেই হঠাৎ আবার লড়ালড়ি বন্ধ। কাউকে আর দেখা গেল না। কালকাসুন্দির বনে এক রাত্তিরের হুজুর-বাদশাহী মজুর-বাদশাহী শেষ করে তারা পুরাকালের মতো পাতাচাপা পড়ে রইলো। কপালে কবে পাতা ওড়ে আবার তাদের—কে জানে!

কঞ্চি আর তলতা আশা করেছিল পলতা ঘাট থেকে ফিরে এসে হেতি হোতিকে বিয়ে করবে। সেইজন্যে গাঁদাল পাতা আর পলতা পাতার দু-গাছি মালাও গেঁথেছিল। এসে দেখলে—না হুজুর, না মজুর, দু-জনের একজনও নাই! তখন ঘরে গিয়ে কালিকুণ্ডুর দুই কন্যে হেতি হোতির শোক-গাথা একটা লিখেছিল পাঁত-সাত পাতা নিশ্চয়। তার চিহ্ন ঘুণাক্ষরে বাঁশ আর তালপাতায় পাওয়া যায় এখনো, কিন্তু পড়া যায় না!

বহিত্র

ভাদ্রমাস কাবার করে চাঁইবুড়ো এসে পুঁথি পাঠ শুরু করলেন—

'শিবরাত্রির সল্‌তে জ্বলতে না জ্বলতে
কুম্ভকর্ণের দুটো ছানা হয়ে লেগেছে
চলতে আর বলতে।

ছেলের কান্নায় রাক্ষসপাড়ায় সবাই করছে নিশি জাগরণ। কুম্ভকর্ণ কেবল ঘুমে অচেতন—নাক-ডাকা চলছে যেন ঢোল আর ঢ্যাটরা পড়ছে।

বিরাশি বুড়ি বলছে—'ওলো কুম্ভকর্ণ, ওউ কুম্ভকর্ণের বউ, তোদের ছানাদুটো চিল্লাচ্ছে যেন ফৌ—কর্ণ বধির করলে যে!'

পিলখানার আঁতুড়ঘরে গোমুণ্ডে জোড়া বাতি ধরে নিশিন্দিবুড়ি বলছে—'ওগো দেখগে তোমরা, জোড়াকাত্তিক মউরের লেগে কাঁদছে।'

রাবণ আর কালনিমি মামা আসতে নিকষি বুড়ি বলছে—'বাবা রাবণ, এদের বাপ তো ঘুমে অচেতন। একজোড়া কাত্তিকের মউর এনে তুমি এখন ওদের ভোলাও, নাহলে বাঁয়া তবলা চাপড়াতে চাপড়াতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ল।'

রাবণ কালনিমি মামার দিকে চেয়ে বলছেন—'মউর কোথা পাই মামা?'

—'কাত্তিকের মউর, সে তো কাত্তিকের শেষাশেষি শরবনে উড়ে পালিয়েছে; একই জাত মোরগ আর মউর, অই দুটো ধরে দাও—আপদ চুকে যাক।'

—'তা কেমন করে হয় মামা! মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ অর্শাবে। কাত্তিকের মউর আনা চাই রাত্রির মধ্যে।'

—'তবে আমি নিরুপায়! শরবন কি এখানে? সমুদ্র-পারে হল কৈলাশ পর্বত, তেরাত্তিরের পথ সেখান থেকে কাত্তিকের জন্মস্থান শরবন—সেখানে হল মউরের আস্তানা। যেতে আসতেই আজকের রাত কাবার হয়ে যাবে।'

—'আমরা যে নিশাচর সেটা ভুললে নাকি মামা?'

—'এই তো বাবা ঝঞ্ঝাটে ফেললে!' বলে মামা ছড়া আওড়ান—

'কৈলাসে কি যেতে আছে শিবরাত্রিতে
ভূতের হাতে প্রাণ দিতে?
মউর ধরা সহজ না এড়ায়ে ভূতপ্রেতের কড়াখানা
জলার পেত্নীরা সরা জ্বালিয়ে
শরবনের ঘাটিতে॥'

—'ফুঃ!' বলে রাবণ মামার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে গমনোদ্যত।

—'থামো বাবা থামো, মামার কথা মানো—

তোমার মাতৃভক্তিতে ধন্যবাদ, রক্ষা কর বাবা রক্ষনাথ।
ফেসাদ বাধালে বিশ্বনাথ চটবে—
যেওনা শিবের পাহাড়ে করতে লুটপাট!

বরং দুটো সিন্ধুঘোটক ধরে দাও—রাজার ছেলে চড়ে খুশি হয়ে যাবে।'

রাবণ কোনো কথা মানে না দেখে মামা আপত্তি তুললেন—

'মাঝ-পথে যে সমুন্দুর!'

রাবণ খানিক ভেবে বললে—'দুখানা তক্তাতে কলসি বাঁধা যাক দু-সার।'

—'বাবা, এ বুদ্ধি কে ঢুকালে মাথায় তোমার?'

—'কেন মামা, ময়দানব আমার শ্বশুর!'

—'বুঝেছি, জামাতার প্রতি শ্বশুরের মমতা প্রচুর।'

যেখানে যত তক্তা, ভাঁড় আর কলসি ছিল দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে রাবণ বললে—'মামা দেখ আর কি, উঠে পড়—একে বলে বহিত্র।'

—'তা বুঝেছি, চল উঠি।'

কুড়ি হাতে জল কাটতে শুরু করলে রাবণ, তেজে চললো বহিত্র।' মামা মাঝির জায়গায় বসে ভাটিয়ালি গীত ধরলেন—

'বাবা, বহে চল বহিত্র
কুড়ি হাতে
দেখো ফুটা না হয় কলস কটাতে
মাঝ-দরিয়াতে অত্র!'

—'সে কি মামা!' বলে রাবণ যত ঝাঁকি টান দেয় ততই গান বার হয় মামার—

'বাঃ বা কী বহিত্রই বানিয়েছে শ্বশুর অতি বিচিত্র
ছারপোকা একরত্তি,
চলল সাগর তরতি
তাউস শিকারে মউর তক্তি চিত্র সুচিত্র॥'

রাবণ আহ্লাদে তিন ঝাঁকি দেওয়াও যেমন, মউর তক্তি অমনি সমুদ্রের ঢেউকে গোঁজা মেরে শরবনে ভীষ্মের শরশয্যায় কাত হয়ে পড়ল—মামা ভাগনেকে নিয়ে।

কালনিমি কাদায় লুটোপুটি, গা ছড়ে রক্তপাত; রাবণকে ডেকে বললেন—'বাপ মাতৃভক্ত, এখন কী করা যায়? তুমিও মরলে মারলে মামায়।'

রাবণ বললে—'ভয় কি মামা, কাত্তিকের জন্মস্থান—স্বর্ণ-শরবন।'

—'খোঁচা-খাঁচা খেয়ে তা বুঝছি বাবা। এখন কাদা থেকে ধরে ওঠাও তো বাঁচি!'

—'কাদা কী মামা, এক খাবল তুলে দেখ, রজত পর্বতের গলিত রৌপ্য খাঁটি।'

—'রও বাবা, জলটা একটু চেখে দেখি—ঠিক হয়েছে—

সিদ্ধি-গোলা জল স্বর্ণ-শরবন,
রজত পর্বত—মউর জোড়া দিলেই হয় ষড়ানন।

বাবা, দাও তো ভেঙে কাটি একটি, দেখি সোনা না গিল্টি!'

—'যা খুঁজতে এসেছি, তাই খুঁজি চল।'

—'আর শরবনে ঢুকে কাজ কী বাবা, কাটিকুটি ফুটলে বিপদে পড়বে।—

আছো স্বপদে সম্পদে এখন,
পদে পদে ঠেকবে তখন।
আছো মদমত্ত হাতি, শরবিদ্ধ হয়ে হবে কানামাছির মতন।
বাবা, বেম্মার কাছে পেয়েছ মুণ্ডকাটি বর,
প্রেকারান্তরে হয়েছ অমর,
চক্ষু গেলে নতুন চক্ষু পাবে—পাও নাই তো সে বর,
চক্ষু যাবে—লজ্জা ও দুঃখ্ রইবে তখন॥'

—'মামা, শরকাঠির খোঁচায় হটেনা রাবণ।'

—'বুঝিয়ে বলো বাবা, না হটবার কারণ!'

—'কেন? পুরোনো মাথা-কটা কেটে ফেলে নতুন মাথার সঙ্গে নতুন চোখ আদায় করে নেব।'

—'বাবা, তোমার বিশ্বাসকে ধন্য, বুদ্ধির তারিফ অগণ্য। আচ্ছা বাবা, এইখানে দাঁড়িয়ে একবার মেঘগম্ভীর স্বরে গর্জন কর তো দেখি, মউর নাচতে নাচতে এসে যায় কি না!'

—'তুমি, মামা, দাদুরীর বোল ছাড়ো।'

—'হা রে নীলার মউর, তোর হীরার চোখে নিশার ঘোর
খেলার মউর বর্ণ গউর—কাঠি কাঠি পা
ডেকে আয় না কোঁকড় কোঁক কোঁকড়—'

—'কই মামা, কারুর দেখা নেই যে?'

—'বাবা, কাত্তিকের মউর কাত্তিকের সাড়া চেনে।'

—'মামা, আকাশে ওটা দেখা যায় কী ধুতরো ফুলের মত?'

—'কৈলাসের চুড়ো আর কি!'

—'চল না মামা, ওখানে উঠি।'

—'রও বাবা, ভাবতে দাও—না, আর যাবার প্রয়োজন নেই।'

—'কেন মামা?'

—'বাবা, দ্রুতগমন নিষ্প্রয়োজন। মউরে চড়ে না ষড়ানন—চড়েন বর্হি।'

—'বর্হি কাকে বলে মামা?'

—'জাতিচ্যুত ঘোড়ার ডিম—তাই ফুটে ছানা বার হয় ক্বচিৎ যদি কোনোদিন, পক্ষিছানা তাকেই বলা হয় বর্হি। পণ্ডিতেরা কাজেই বলেছেন—

তর্হি বর্হির বৃথা অন্বেষণ,
চোখ কান থাকতে কর আস্তে আস্তে গমন।
শিব শিব বলি শিবরাত্রিতে জোড়হাত
জোড়া কাত্তিকে না হয় রাত কাবার।
বলো ছানাপোনা সদ্যোজাত অকস্মাৎ
না করে উৎপাত কেঁদেও করে চিৎকার।'

—'একথা বললেই হত তখন!'

—'বাবা, তোমার তাড়ায় হয়েছিলাম বিস্মরণ।'

মামা ভাগনে দুজনে এ ওর কান মলে সে তার নাক মলে বহিত্র বেহে করুন পুনরাগমন।

এসে দেখে কুম্ভ নিকুম্ভ দুটোতে ঘুম-গড়াগড়ি যাচ্ছে তক্তার নিচে—আর সাড়াশব্দ নেই।

এই বলে চাঁই-বুড়ো উঠে আস্তে আস্তে প্রস্থান—পা টিপে টিপে।

———

জেন্ত-সভা

বা

জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি

জেন্ত-সভার প্রথম অধিবেশনের অস্থায়ী সম্পাদক সজারুর চতুষ্পদীকা টিপ্পনি ; যথা :—

প্রস্তাবনা

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা—এ কেবল কথার কথা। জীব-সৃষ্টি হয়ে অবধি মনু আর সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মানুষরা মুখেই বলে আসছে 'জীবে দয়া', কিন্তু কাজের বেলায় আমাদের কাউকে দেখে জিভে জল আসে—চোখে নয়, এটা জানা কথা, কাজেই মানুষ যতই জিভ নেড়ে বলুক—জীবে দয়া, করছে ঠিক এর উল্টোটা। এই কারণে যত জীবজন্তু এমনকি পোকামাকড় তারা পর্যন্ত জালাতন হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে আর ভাব রাখা চলচে না। বাস্তবিক মানুষের চেয়ে আমরা কমটা কিসে যে চিরদিন তাদের শাসনে চলতে হবে, হুকুমের চাকর ?

মানুষের সঙ্গে কোনো আর বাধ্যবাধকতা না রাখাই স্থির করে, ছোট বড় সব জানোয়ার মিলে এক সভা গঠন করা গেছে, যার নাম হচ্ছে—মনু-তাড়নী জান্তব হিতকারী জাতীয় মহাসমিতি বা জেন্তসভা।

ইতিমধ্যেই সভাটির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। গত পূর্ণিমায় আলিপুরের সরকারি চিড়িয়াখানার গোলচানকাতে এই সভার প্রথম অধিবেশনের বন্দোবস্ত করা গিয়েছিল, কেননা পৃথিবীর জীবজন্তুকে একত্র করার পক্ষে এমন স্থান আর দ্বিতীয় নাস্তি! একথা বলাই

বাহুল্য যে, সেদিনের সভার কাজ পাশব প্রথা-মতো যতদুর সম্ভব বাঘাড়ম্বর ইত্যাদি দ্বারায় সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্যে প্রাণপণের ত্রুটি হয়নি।

অভিভাষণ

স্বাধীনতার মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপুরুষ বীর বনমানুষ—তিনি উৎপীড়িত জীব-জগৎকে মুক্তি দিতেই যেন বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে গভীর রজনীতে বিশ্ব যখন ঘুমে ঘুমাইত, সেই শুভ মুহূর্তে পশুশালার তালাবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরাবলীর অর্গলাদি ও লৌহ-শলাকাসঙ্কুল শৃঙ্খলাবদ্ধ দ্বারাদি উন্মুক্ত করে দিয়ে গেলেন। আজীবন বন্দী, চিরদিন বদ্ধ জীব মুক্তির মধুরাস্বাদ পেয়ে বীর-রসের রুধিরাস্বাদে বলীয়ান হল ও উন্মুক্ত আকাশ-তলে পুনরায় দাঁড়িয়ে সিংহনাদ হ্রেষা বৃংহিত চিৎকার চিচিকার করে একে একে এসে জান্তবীয় ভৈরব-চক্রে স্ব-স্ব স্থান অধিকার করে বসল। জাতি-নির্বিশেষে গৃহপালিত গবাদি চক্রের সম্মুখভাগে, শার্দূলাদি বন্যগণ চক্রের পশ্চাতে এবং সরীসৃপাদি ভূচরগণ চক্রের তলদেশে ও জলচর খেচরগণ চক্রের উর্ধ্বদেশে আশ্রয় করলেন, আর বিরাট এই জেন্তু-সভার কার্যাবলী নিরীক্ষণ করবার মানসেই যেন চন্দ্রমা সেদিন পূর্ণকলায় উদ্ভাসিত হয়ে, অন্ধকার তরুশিখর ছাড়িয়ে ক্রমে আকাশে আরোহণ করতে থাকলেন। (সাধু! সাধু!) মানুষদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-সংস্কার এমনি সব ব্যাপার নিয়ে বিরাট সভা অনেক হয়েছে এবং সেসব সভায় খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি হাতাহাতি গালাগালি এমনকি জুতো-মারামারিও হতে বাকি নেই, কিন্তু আমাদের এই জেন্তু-সভায় বড় বড় হাড়-ভাঙা ঘাড়-ভাঙাদের কথা দূরে থাক, মশা মাছি টিকটিকিটি পর্যন্ত যে শান্তশিষ্ট ভাব দেখিয়েছেন তা কোনোকালে কোনো সভায় গিয়ে মানুষ পারেনি, পারবেও না। হেড়েলের ডাকের মধ্যে কে জানে সেদিন কেমন একটি অপূর্ব কোমল সুর লেগেছিল—অরগানের তিন সপ্তকে যতগুলি কোমল কালো সুর সবগুলি একই সঙ্গে! আর রাজহংসের গলা থেকে কড়ি সুরের

ঝরনা কারুণ্য রসে সবাইকে বিগলিত-প্রায় করে দিয়েছিল (বেশ, বেশ ! আহা !)

প্রার্থনা

কী অপূর্ব সঙ্গীত, কী স্বর্গীয় সুধাময় সুস্বর ! আহা কী দেখলেম, কী শুনলেম, জীবন ধন্য হল, আত্মা পবিত্র হল, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল ! শান্তিঃ, শান্তিঃ, চারিদিকে শান্তিঃ ! উত্তরে শান্তি, দক্ষিণে শান্তি, পুবে শান্তি, পশ্চিমে শান্তি, উর্ধ্বে শান্তি, অধে শান্তি, ভিতরে শান্তি, বাহিরে শান্তি, অন্তরের অন্তরে গভীর প্রেম, বিপুল শান্তি ! হে পশুপতি, তুমি কত করুণাময় ! তুমিই ধন্য, ধন্য তোমার সৃষ্টি, অবোধ অবোলা জীবজন্তুদেরও প্রাণে এত মায়া, এত ভালোবাসা, এত প্রেম, এমন গভীর পরহিতৈষণা—আহা ! মানুষ, দ্যাখো, শেখো, ধন্য হও, শান্তিরস্তু জীবংচান্তু।

জাতীয় সঙ্গীত

আর না—আর না—
তোলোরে তোলো ফণা—মেলোরে মেলো ডানা
আর না—আর না—
হাম্বুর হাম্বুর গরজনে,
কাঁপুক অম্বর ক্ষণে ক্ষণে,
ত্রাসিত মানব রণে-বনে
উঠুক ভীষণ কান্না,
আর না—আর না—

(কোরাস)

ঘাসদায়িনী, মাসহারিণী,
শিংঅশালিনী গো !
নখমালিনী হো
ম্যা ম্যা গা গো
পিচকচক্ ক্যাঁ কোঁ ! (করতালি)

ঘুণাক্ষর রিপোর্ট

সভার প্রারম্ভেই ছোট বড় খাদ্য খাদক-অভেদে সমস্ত জীব-জন্তুতে মিলে কোলাকুলি, সে এক অভূতপূর্ব অভাবনীয় দৃশ্য, সকলেই এমন আবিষ্ট হয়েছিলেন যে আলিঙ্গন-চুম্বনের হুল্লোড় হয়ে গেল! আর কোলাকুলি গলাগলি পাকড়া-পাকড়ি থেকে দুএকটা রক্তপাত যে ঘটেনি, তা নয়। আমাদের শৃগালভায়া এমনি প্রেমভরে পাতিপুকুরের হাঁস-গিন্নির গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন যে তাতে করে গিন্নির সরু গলা তখনই বাতাহত মৃণালদণ্ডের মতো ভেঙে পড়লো, নেকড়ে-বাঘের সঙ্গে কোলাকুলিতে ভেড়ার, আর গো-বাঘার সঙ্গে জাপটা-জাপটিতে ঘোড়ার ঐ একই দশা হয়েছিল! প্রতিপক্ষেরা হয়ত বলবেন, যে খায় আর যাকে খায় এ-দুজনে কোলাকুলি করতে গেলেই এই ফল ; কিন্তু আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি প্রেমের আতিশয্যই হচ্ছে এই সামান্য দুর্ঘটনার মূল, তা ছাড়া বৃহৎ কাজে এমন হয়েই থাকে! সুতরাং এ-সব ছোটোখাটো দুর্ঘটনাতে মন না দিয়ে সভ্যগণকে সভার কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করে, গগনভেদ পক্ষী—তিনি তারস্বরে যে তিন মহাপ্রাণ জীব জেন্ত-সভার সূত্রপাতেই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিলেন, তাঁদের অমর আত্মার কল্যাণের জন্য পশুপতি-স্তোত্র পাঠ করে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন।

শ্যাম দেশের মহাস্থবির শ্বেতহস্তীর 'সর্ব জীবে দয়া' নামে প্রবন্ধ পাঠ এবং জীবহিংসা নিবারণ-কল্পে এক পিঞ্জরাপোলের প্রস্তাব করার কথা ছিল, কিন্তু বক্তা বক্তৃতামঞ্চে উঠবার মুখেই তাঁর গোদা-পায়ের চাপনে একটা উইঢিপি মায় পিপীলিকা-বংশ ধ্বংস হয়ে গেল, শ্বেতহস্তীর সেটা খবরই হল না। কোলাব্যাং কট্ কট্ করে কু-কথা শুনিয়ে হস্তীর দৃষ্টি এই দুর্ঘটনার দিকে আকর্ষণ করায়, সেই মহাকায় নিকায় পাঠ করে অনুতাপ করতে থাকলেন, কাজেই তাঁর ঐ প্রস্তাব-দুটোই আর সভাতে উপস্থিত করা হল না।

শেষ

পরিশেষে বক্তব্য যে, তোতারাম বাবাজী যেমন কইলেন, সম্পাদক সজারু চতুষ্পদীতে তাই লিখে নিলেন। এই রিপোর্ট অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, কেননা এ জানা কথা যে তোতা—তিনি যা শোনেন তাই আউড়ে যেতে একেবারে পাকা। আর মাছি, তিনি মাছি-মারা কাপি যখন নিয়েছেন, তখন এতে ভুল ভ্রান্তি নাই বললেও চলে। সেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র মাছি ও তোতারাম, তাঁদের আসল নাম-ধাম প্রকাশ করা গেল না, কেননা ইদানীং তাঁরা রাজনীতি সমাজনীতি এ-সব থেকে আড়ালে আবডালে থাকাই মানস করেছেন, কেবল আমার সনির্বন্ধ অনুরোধেই এবারের মতো এঁরা আমাদের সভায় রিপোর্টার ও কাপিইস্ট পদ গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে তোতারামের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হল।—ইতি

অস্থায়ী সম্পাদক

সজারু

জেন্তু-সভার বিস্তারিত বিবরণী

চট্টগ্রামের কুঁকড়ো, কলেজ স্কোয়ারের তোতাপণ্ডিত এবং মিস্টর হনুম্যান অব কলাগাছির দ্বারায় লিখিত ও প্রকাশিত।

সভার স্থান—আলিপুর চিড়িয়াখানার গোলবাগিচা।

কাল—ইলেবন্ থার্টি পি-এম, মুনডে, ফার্স্ট মে পাংচুয়ালি।

কার্য-তালিকা—(ক) সভাপতি নির্বাচন। (খ) মানবজাতিকে জাতচ্যুত করার প্রস্তাব এবং তদ্বিষয়ে কী উপায় অবলম্বনীয় সে বিষয়ে গবেষণা। যাঁহারা মানব-জাতির দফা-রফায় মত দিবেন, তাঁহারা বামহস্ত উঠাইবেন, যাঁহারা মানব-জাতির সহিত রফা করিয়া চলিতে চাহেন, তাঁহারা দক্ষিণ হস্ত উঠাইবেন। (গ) প্রধান প্রধান বক্তাগণের নাম সিংহ, ব্যাঘ্র, হয়, হস্তী, হরবোলা, শৃগাল, কুক্কুর ইত্যাদি। (ঘ) চিড়িয়াখানার ডাক্তারের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার

জন্য চাঁদা সংগ্রহ এবং মৃত ডাক্তারের স্থানে মানুষ না হইয়া ঐ পদে কোনো পশু কেন না বসিবেন, এই মর্মে পার্লামেণ্ট মহাসভায় শোক-প্রকাশকারী এক ল্যামেণ্টেবল দরখাস্ত প্রেরণ ও এ দেশে রীতিমত অ্যাজিটেশন বা আন্দোলন করার প্রস্তাব।

মুচিখোলার থেকে আরম্ভ করে যেখানকার যত ময়ূর আর বকের পালনকারীদের চিড়িয়াখানা আছে, সবগুলো থেকেই মোড়ল মাতব্বর নামজাদা খগেন্দ্রগণ তো এসেছেনই, তা ছাড়া ঝাঁটা-গোঁপ লম্বা-দাড়ি ধাড়ি-বাচ্চা চুনো-পুঁটি মাকড়-ধোকড় ফিড়িং-ফড়িং কাগা-বগা কেউ আর আসতে কসুর করে নি।

আলিপুরের অত বড় যে বাগান, তার অলি-গলি মাঠ-ময়দান একেবারে জীবে জীবারণ্য হয়ে গেছে—শিং ঝুঁটি আর ন্যাজে গিস্-গিস্ করছে, কিন্তু সভার পূর্বদিকে চিড়িয়াখানার সিবিল সার্জনের হঠাৎ মশার কামড়ে অকালমৃত্যু হওয়ায় সকলের মুখেই—এমনকি উদ্যানের তরুলতাগুলির উপরেও—যেন কি একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে! ওর মধ্যে যারা ডাক্তারকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এমন সব সুসভ্য জানোয়ার, তাঁরা অশৌচ চিহ্ন কাছা পরেই এসেছেন আর হামবড়া নব্য জানোয়ারের দল তারা কাছা কোঁচা দুই বর্জন করে কালোর উপরে কালো এক-একটুকরো ফিতে লাগিয়ে গোম্‌সা মুখে এদিক-ওদিক করছে। এখানে ওখানে হোমরা-চোমরা সভ্য জন্তুরা দল বেঁধে খুব উৎসাহের সহিত সভার কাজ কী ভাবে চলবে, কী কী নিয়ম কানুন হবে, কাকেই বা সভাপতি করা যাবে, এইসব নানা দরকারি তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত রয়েছেন। হ্যাট কোট চশমাতে ফিটফাট মিস্টর হনুন্যানকে আসতে দেখে গাছতলায় বনমানুষ বলে উঠলেন—'ইনি যে মানুষের নিকট-সম্পর্ক কেউ, সেটা বোঝাতে এঁর যে বিশেষ চেষ্টা রয়েছে তা বেশই বোঝাচ্ছে ওঁর বেশ।'

বহুরূপী বললেন—'মানুষের অনুকরণটা কিন্তু করেছে দিব্বি।'

বনমানুষ চোখ মট্‌কে বললেন, 'অনুকরণ এক, হনুকরণ অন্য জিনিস।'

ঘাসের মধ্যে থেকে সাপ ফোঁস করে বলে উঠল—'ইস, ভঙ্গিমা দেখ! লজ্জা নেই! ভুস!'

বুড়ো দাঁড়কাক গাছের উপর থেকে জবাব দিলে—'ছ্যাঃ, মানুষের চাল-চোল বানরে কখনো সাজে! ভরতচন্দ্র তো স্পষ্ট বলে গেছেন—'যার যাহা তারে সাজে।'

হুতোম প্যাঁচা দাঁড়কাককে সাধুবাদ দিয়ে হনুর দিকে চেয়ে কেবলই বলতে লাগলো—'হুয়ো, হুয়ো, সাত নকলে আসল ভেস্তা।'

গোদাচিল, সে ছড়াও জানে না পড়াও জানে না, কিন্তু তবু কাক ও প্যাঁচার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ছে দেখে হরবোলা পাখি চিলকে ঠেস দিয়ে বলে উঠলো—'পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ সমস্যা পুরায়, মূর্খে নাহি বুঝে তাহা জুল-জুল চায়।' বহুরূপীর বিশ্বাস ছিল রং-তামাসায় তার মতো কেউ নেই, কিন্তু হরবোলা গোদাচিলের সঙ্গে ভালো রং করে নিলে দেখে হিংসেতে বেচারা প্রথমে আগাগোড়া রাঙা—তারপর একেবারে নীলবর্ণ হয়ে গেল।

এই সময় ধ্যান ভেঙে কচ্ছপ খোলা থেকে মুখটি বার করে বলে উঠলেন—'বুঝেচো কিনা, জীবনটা অতি প্রকাণ্ড একটা স্বপ্ন-বিশেষ, এরই জন্যে আবার ঝগড়া-ঝাটি মারামারি! আপনার মধ্যে আপনি একবার তলিয়ে দেখ দেখি, জগৎই বা কী তুমিই বা কে আর—জগৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি'—বলেই কচ্ছপ ঘুমিয়ে পড়লেন। আকাশ থেকে একদল তালচড়াই কিচমিচ করে বলে উঠলো,—'হেসে খেলে নাওরে জাদু মনের সুখে!' নতুন পালক-ওঠা পিঁপড়ে, শোনা যায় না এমন মিহি সুরে একবার বললে—'কবে যাবে তুমি সিঙে ফুঁকে,' তারপরেই সে আকাশে উড়ে পড়লো আর সঙ্গে-সঙ্গেই তার পিঁপড়ে-লীলাও সাঙ্গ হল। শুঁয়ো পোকা এই দেখে ঝাঁটা-গোঁফ ফুলিয়ে আওড়ালে—'পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে।'

এইবার সভার কার্যারম্ভের ঘণ্টা পড়লো। জীব-জন্তু যে যেখানে ছিলেন একে একে গোলচানকাতে এসে তালি দেবার জন্যে ন্যাজ

আর বক্তৃতা শোনবার জন্যে কান খাড়া করে বসলেন। সবাই চুপ-চাপ রয়েছেন, এমন সময় গাধা, তিনি হঠাৎ 'গোল হচ্ছে' বলে চিৎকার করে উঠলেন। একটা কানামাছি ছাড়া গাধার কাছে আর কেউ গোল বাধায় নি, গোলচানকাতে সবাই গোল হয়েই চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু তবু গাধা 'চোপ্ চোপ' শব্দে আসর সরগরম করে তোলবার চেষ্টা করতে থাকলেন। গাধার বন্ধুবান্ধবরা মিলে তাঁর জন্যে একটা বক্তৃতা লিখে দিয়েছিল, কেবল গলার জোরেই তিনি সবাইকে মাতিয়ে তুলতে পারবেন এই বিশ্বাসে প্রথম বক্তৃতার ভার গাধার উপরেই পড়েছিল। দু-চার জন দুষ্টু জন্তু কানাকানি করতে লাগলো কেমন করে পিছন হটে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে, গাধা এই বিষয়েই বলবেন। যা হোক গর্দভ, কে কোথায় বাহবা দিচ্ছে তারই একটুও হাততালি যেন না এড়িয়ে যায় এই মৎলবে দুই কান খাড়া করে ন্যাজ নেড়ে বক্তৃতা শুরু করলেন—

'লম্বাকান জাতভাইগণ, চার-ঠ্যাং দুই-ঠ্যাং স্বদেশী বিদেশী পাড়াপড়শি ও বনবাসীগণ, আজিকার এই জন্তু-সভায় সভাপতি নির্বাচন হল একটি প্রধান কাজ। এটা কারো জানতে বাকি নেই যে যিনি আজ এ সভায় সভাপতি হবেন, তাঁকে গুরুতর কাজের ভার নিতে হবেই। মানুষের কাছে দাসত্ব করতে দুঃখের বোঝা বইতে বইতে আমাদের চারখানা পা ভেঙে পড়বার জোগাড় হয়েছে, পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে, এ অবস্থায় সব জীবের ভার লাঘব করে নিজের স্কন্ধে নিতে পারে, এমন একজন আমি ছাড়া আর কে আছে? আমরা চতুর্দশ পুরুষেরও চতুর্দশ পুরুষ ধরে ভারই বহন করে আসছি, দেবতা থেকে ধোপার মোট পর্যন্ত কী না আমাদের বইতে হচ্ছে, ভার বইতে বইতে পিঠে কড়া পড়ে গেল এমনি যে, সেটা বংশগত একটা গুণের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের! অতএব এস আর্ত আত্মীয়-কুটুম্ব, এস দেশী বিদেশী পাড়াপড়শি, যে যেখানে আছ সবাই মিলে সভাপতির গুরুভার আমার উপরে চাপিয়ে দাও। আমি অনায়াসে তোমাদের সব

কার্যভার, বিপদভার, আপদভার, আনন্দভার গ্রহণ করছি, দাও। এটা তোমাদের দু-বার করে বলতে হবেনা যে, যেমন সইতে তেমনি বইতে, তেমনি আবার গোঁসা করে নিজের গোঁ বজায় রাখতে আর কিছুর উপরে পদাঘাত করতে, গাধার মতো আজন্মসিদ্ধ কেউ নেই—'

গাধা বলে চলেছেন এমন সময় জিরাফ তাঁর রেফের মতো গলাটা উঁচিয়ে বলে উঠলেন—'চিরকালটা মানুষের গোলামি আর যমের বাড়ির যাত্রীদের গাড়ি টেনে এসে এখন জেন্তু সভায় সভাপতি হতে চায় গাধা, এ কী আস্পর্ধা!'

জিরাফের কথায় গাধা ভীষণ চটে অভ্যাসমতো লাথি চালাতে যাবেন, এমন সময় ভাল্লুক 'থামো থামো' বলে এক ধমকে গাধাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে বলতে শুরু করলেন—

'ভাই সকল, একে এই কলকাতার দুরন্ত গরমে তিষ্ঠানো ভার, তার উপরে তোমরা সবাই যদি গরম হয়ে উঠে হাতাহাতি লাথালাথি করতে থাকো, তবে আমাকেও পৃথিবীর শেষ বরফের দেশে ফিরে যেতে হবে, যাবার পূর্বে দু-চারটে চড়া কথা শুনিয়ে। বরফের দেশে হিমসিম আমি যথেষ্ট খেতে পাই, কেবল তোমাদের মুখ চেয়েই আমি কষ্ট করে—একরকম উপোস করেই—এখানে কাটাচ্ছি ; এখন সবাই যদি মানুষের মতো অগ্নিমূর্তি হয়ে এই সভার মধ্যেকার এবং প্রত্যেকের প্রাণের মধ্যেকার জমাট প্রেমের ক্ষীণ ধারাটি পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করো, তবে ভালো হবেনা বলছি।'

বরফের দেশের ভালুকের গলা পেয়ে উত্তর আর দক্ষিণ সাগরের 'সীল' মাছগুলো কাঁপছে দেখে সিংহ 'চোপরাও' বলে ভাল্লুককে থামিয়ে দিলেন। এই ফাঁকে রতা-শেয়ালটা কখন গিয়ে বক্তার মাচায় উঠে জাঁকিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলে। দু-এক কথায় শেয়াল সব জানোয়ারদের বুঝিয়ে দিলে যে, পশুপতির যেমন ত্রিশূল, ইন্দ্রের যেমন বজ্র, প্রজাপতির যেমন কমণ্ডলু, তেমনি সভাপতির একটা অস্ত্র হচ্ছে ঘণ্টা, আর সেই ঘণ্টা একমাত্র ধর্মের ষাঁড়ের গলাতেই ঝোলানো

দেখা যাচ্ছে, অতএব ষাঁড়ই সভাপতি হবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।

সর্বসম্মতিক্রমে ষাঁড়ই গলঘণ্টা আর গলকম্বল দুলিয়ে সভাপতির আসনে গিয়ে বসলেন। ডালকুত্তা এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, ঘণ্টার শব্দে হঠাৎ চমকে উঠে ভাবলে তার মনিব আপিসের বাবুকে ডাকতে বুঝি ঘণ্টা দিলেন, অমনি কুত্তোটা 'কোই হ্যায়' বলে হাঁক দিয়ে চারিদিক চাইতে লাগলো। কুত্তোর রকম দেখে নেকড়ে-বাঘ একবার নাক সিঁটকে মুখ ফেরালে। বেড়াল হাঁসের একটা কলম কেড়ে রাতের শিশিরে ভিজে গা একবার ঝাড়া দিয়ে, সটপট নোট নিতে লেগে গেল। তোতাপাখি গিয়ে বক্তা আর শ্রোতা দুইজনের মধ্যে বসে রিপোর্ট নিতে লাগলেন।

এইবার রক্তমাখা কটা-চুল সিংহ ঝাঁকড়া মাথা ঝাড়া দিয়ে গম্ভীর মুখে সভার মধ্যিখানে উঠে বলতে শুরু করলেন। যেন মেঘ ডাকছে এমনি গুরুগম্ভীর আওয়াজে সিংহনাদ করে তিনি মানুষের অত্যাচার আর অবিচারের কথা বর্ণনা করে বললেন—'এই মানুষের হাত থেকে বাঁচবার এক রাস্তা, আর সে রাস্তা তোমাদের জন্যে খোলা রয়েছে! এসো আমার সঙ্গে জনমানবশূন্য সুদূর খাণ্ডব বনে। অতি নির্জন সে স্থান, তেপান্তর মাঠে ঘেরা, মরুভূমির মধ্যেকার ওয়েসিস সেটি, বর্বর মানুষগুলো তার ত্রিসীমানায় যেতে পারে না এমন দুর্গম ভীষণ সে স্থান! মানুষের যত বড়াই লোকালয়ের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে, ফাঁকায় আর নিরালায় পেলেই আমরা তাদের ঘাড় মটকে রক্তপান করি।' এই সময় বাঘের দিকে চেয়ে একটা গরু দুবার গলা-খাঁকানি দিল, সিংহ একটুখানি মুচকে হেসে বললেন—'এ কথা আমি কাউকে ইঙ্গিত কিম্বা ঠেস দিয়ে বলছি নে, সত্যিই বলি, মানুষের মধ্যে সিংহবিক্রম এমন কে আছে যে রণে বনে আমাদের সামনে এগোতে পারে!'

সুন্দরবনের বাঘ এই শুনে কাষ্ঠহাসি হেসে ঝাঁটাগোঁফ দুবার

মুচড়ে একবার ভাঙা গলায় বাহবা বলে হাততালি দিলে। তারপর সিংহ মরুভূমির চমৎকার শোভা, শান্তি, মুক্তি আর নির্ভয় আনন্দময় জীবনের একটি বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা বন্ধ করলেন।

হাতি উঠে প্রস্তাব করলেন যে, সকলকে নিয়ে ছোটনাগপুরে নাগা পর্বতে যাওয়াই ঠিক, কেননা সেখানে হাতি-চোখের গাছ যথেষ্ট পাওয়া যায়, দাঁতে চিবিয়ে খাবার সামগ্রীর কোনোদিন কারুর অভাব হবে না, তবে খাবার জলের একটু কষ্ট হবে, কিন্তু যদি উট মোষ হাতি আর মশা এঁরা মশক কুঁজো পিচকিরি আর নল ভরে ভরে পাহাড়ে তুলে দেন, তবে জলার জল সমস্তই পাহাড়ে উঠবে জালা জালা, জীবের জলকষ্টও সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে।'

হাতির প্রতিবাদ করে জল-হস্তী বলে উঠলেন—'জলার জল জলাতে রাখলেই মঙ্গল, মিষ্টিও থাকবে ঠাণ্ডাও থাকবে, নয় তো হাতিরা সবাই গিয়ে জলার জল তুলতে নামলে জল কাদায় এমন ঘোলা হবে যে, সে জল কারুর আর মুখে দিতে হবে না।'

কুকুর এই সময় হঠাৎ মাথা গরম করে চেঁচিয়ে উঠলো—'তোমরা যাই বল, আমি তো বলি, সহরে থাকায় যেমন সুখ এমন আর কোথাও নয়!'

গো-বাঘা, নেকড়ে আর হোড়েল তিনজনে পড়ে কুকুরের কোটের লেজ ধরে টেনে বসালে। তখন সুন্দরবনের বাঘ হুঙ্কার দিয়ে, মাচায় লাফিয়ে উঠে ন্যাজ আফসে বক্তৃতা আরম্ভ করলে—'আমরা লড়াই দেবো, খুন জখম রক্তপাত করবো, মানুষের জাতকে জাত পৃথিবী থেকে লোপ করে দেবো! এসো সব বড় বড় জানোয়ার, সেনাপতি হয়ে এগিয়ে এসো, আর ছোটোখাটো জীবজন্তু, তোমরাও ভয়ে পিছিও না। ছোট হলে কী হয়, গ্রীসের ইতিহাস যদি পড়ে দেখ তবে দেখবে অতবড় 'টেরাগোনা', তাকেও জনকতক খরগোস মিলে রসাতলে পাঠিয়েছিল, বীর আলেকজাণ্ডার তুচ্ছ একটুখানি মদের পেয়ালার কাছে পরাভূত হলেন, আর আমাদের হনুমান রাবণের লঙ্কা দগ্ধ

করলেন, কাঠবেরালি সমুদ্রে বাঁধলেন, এতটুকু লাঙলের ফলায় অত বড় যদুবংশটা ধ্বংস হয়ে গেল! ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে টুনটুনিও হাতিকে সাবড়ে দিতে পারে, আর আমরা মানুষগুলোকে নির্বংশ করতে পারবো না? আর নিস্তার নেই, জগৎ-জোড়া মানব-রাজত্ব এইবার শেষ হল দেখছি। দুরন্ত মানুষ বন সব কেটে কী অত্যাচার না করছে জন্তুদের উপরে! আমাদের ঘরছাড়া করছে, জঙ্গল জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মাঠ সব চষে ফেলছে। নিজেদের ঘর ওঠাতে, ক্ষেত বসাতে, গলিজ সহর ওঠাতে, রেলগাড়ি চালাতে, চুলো ধরাতে, গোরুপা পৃথিবী—যিনি জীবজন্তু সবার মায়ের তুল্য, তাঁরও বুকে শাবল আর কোদাল বসাতে মানুষ একটুও ইতস্তত করছে না, আর নিজের গায়ের শক্তি বাড়াবে বলে মানুষ ঘাড় মুটকে পুড়িয়ে ঝলসে পাখি থেকে আরম্ভ করে জলের তলাকার গুগলিটা পর্যন্ত—কার মাংস যে না খাচ্ছে তা তো জানিনে। দু-হাতে ডাইনে বাঁয়ে মানুষ সব জন্তুকে খুন করে চলেছে। হরিণ আর বাঘ মেরে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তার উপরে বসে যোগযাগ না করলে তাদের ধর্মকর্মই হয় না, জলের কুমির ডাঙার বাঘ মেরে এদের নখের ইষ্টি-কবচ ধারণ করে আর আমাদের চর্বি মালিশ করে তারা নিজেদের গায়ের বাত সারাতে চলে। চিড়িয়াখানায় আমাদের বন্ধ রেখে তারা মজা দেখে, আর জ্যান্ত অবস্থায় খাঁচায় বন্ধ থেকে যখন আমরা আধপেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরি, তখন আমাদের ছালখানার মধ্যে খড় পুরে জাদুঘরে কাঁচের সিন্দুকে তারা নানান ভঙ্গীতে সঙের মতো আমাদের সাজিয়ে রাখে, এমনি বজ্জাত মানুষগুলো! দাও তাদের ঘাড় মটকে, খাও তাদের মাথাগুলো কড়মড়িয়ে চিবিয়ে!'

বাঘের বক্তৃতা শুনে কচি পাঁঠাগুলোর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগলো দেখে বাঘের নিজের জিভেও জল এলো, বাঘের নখগুলো এতক্ষণ থাবার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে ছিল ; পাঁঠার ভক্তি দেখে ধারালো সব নখ যেন সেই ছাগলছানাদের আশীর্বাদ করার জন্যে

বেরিয়ে এল ! বাঘ ভাবে গদগদ হয়ে ছাগলটির দিকে হাত বাড়িয়ে বলে চললেন—'আহা বাছা কাঁদবে বইকি, মানুষ নিজের ছেলেমেয়ের বিয়েতে তোমার মা-বাপ দুজনকেই কালীঘাটে হাঁড়িকাটে বলি দিয়ে নিজের জ্ঞাতি-ভোজন করিয়ে যথেষ্ট আমোদ পেয়েছে, ন্যাজা মুড়ো ছাল চামড়া এমনকি ক্ষুর কখানাও তারা ফেলতে দেয়নি, এমন চেটেপুটে তারা পাঁঠার ঝোল খেয়ে গেছে যে আমি যে বাঘ—আমিও তেমনি করতে লজ্জা পাই—কী লজ্জা, কী লজ্জা। এই সসাগরা পৃথিবী তো এককালে আমাদেরই ছিল—তখন তো কোনো বালাই ছিল না—খাও দাও সুখে ঘরকন্না করো, মানুষ যেমনি এল অমনি সঙ্গে সঙ্গে এল তার বন্দুক, আর এল হঠাৎ মৃত্যু—হঠাৎ অপঘাত মৃত্যু, অপমৃত্যু, দুঃখ-শোক, ভয় ভাবনা আর যন্ত্রণা বনবাসীদের জন্যে ! বন্ধুগণ, একতার ধ্বজা তোলো, ছোট বড় সব ন্যাজ উঠুক আকাশের দিকে, বল একস্বরে—জয় জীব-জন্তু জঙ্গলম্। চুলোয় যাক মানুষের প্রতাপ !' হাম্বুর হাম্বুর করে তিনবার হাঁক দিয়ে বাঘ আসন গ্রহণ করলেন।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে পেন্সন-পাওয়া পিঁজরাপোলের একটা বেতো ঘোড়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বললে—'ভদ্র বনচরগণ, রাজনীতি-ক্ষেত্র আমার নয়, কেননা সবুজ ক্ষেতে আর মাঠে বাজির খেলা নিয়েই আমি সারা জীবনটা প্রায় কাটিয়েছি, অতএব আমি আমার এ জীবনে মানুষের সম্পর্কে এসে কী দুঃখ পেয়েছি, সেইটুকুই কেবল বলি। একদিন ছিল যখন তাজী ঘোড়া বলে মানুষ আমাকে সোনার গামলাতে রাজার হালে দানাপানি দিয়েছে, তারপর একদিন এল যখনি কেবলই অনাদর আর চাবুক আর হাড়ভাঙা খাটুনি। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর আমি, আমার শিরায় শিরায় রক্তের বদলে সোমরস চলেছে—সবুজ ঘাসের, সবুজ পত্রের কাঁচা আর টাটকা রস। কিন্তু হায়, তবুও আমি আমার মানুষ-মনিবকে ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলায় জুয়াচুরিতে জিতিয়ে দিতে অপারগ হলেম। মনিব

হতাশ হয়ে আমাকে গোলামের মতো বাজারে নিয়ে বিক্রি করে এল ! কিন্তু তখনো দুর্দশার চরম হয়নি, আমি রাজার ডাকগাড়ি টানবার ভার পেলুম। আর যাই হোক সুখ আর মান-সম্ভ্রমের হানি তখনো বড়-একটা হয়নি, কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ কলের গাড়িতে ডাক এনে হাজির করলে, সেইদিন থেকে আমার অন্ন গেল, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্দশার পর দুর্দশায় আমি মরণাপন্ন হয়ে ঠিকে-গাড়ির আস্তাবল থেকে মুনিষ্যি-পালের ময়লা-গাড়ি টানতে টানতে খোঁড়া হয়ে শেষে পিঁজরাপোলে গিয়ে পড়লেম ! এখন মলেই বাঁচি, কিন্তু তার পূর্বে আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, তোমরা যেমন করে পারো কলের গাড়ির রাস্তা বন্ধ করো আর সভা থেকে একটা গোচারণের মাঠের ব্যবস্থা করো—যাতে করে দুর্বল আমরা আর-একবার সবুজ পত্র সবুজ ঘাসের আস্বাদ পেয়ে, নবজীবন লাভ করে জেন্ত-সভাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে পক্ষিরাজ ঘোড়ারূপে স্বর্গপথে যাত্রা করি। উচ্চৈঃশ্রবার শেষ সন্তান আমরা, বাস্তবিকই আপনাদের কৃপাপাত্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।'

সভাপতি ষাঁড় ঘোড়ার দুঃখ-কাহিনী আর গোচারণের মাঠগুলির কথা শুনে এতই কাতর হলেন যে, দশ মিনিটের জন্যে সভার কাজ বন্ধ রাখবার জন্যে তিনি ঘণ্টা দিয়ে একবার বাইরে বিশ্রাম করতে চললেন। জলচরগণ এই সময় একবার খালে বিলে নেমে জলযোগ করে নিতে লাগলো ; খেচরদের মধ্যে কেউ কেউ উড়ে উড়ে একটু হাওয়া খেয়ে নিলে, আর উভচর স্থলচর, তারা—কেউ স্থলপদ্মের ডাঁটা, কেউ বা মাছের কাঁটা, কেউ মুরগির ঠ্যাং, কেউ বা তার চেয়ে মোটা হাড় দাঁতে ভেঙে চটপট ব্রেকফাস্ট করে নিতে লাগলো।

দশ মিনিটের পরে আবার টুংটাং করে গলঘণ্টা বাজিয়ে ষাঁড় মাঠ থেকে এসে মাচায় ঢুকলেন, সবাই যে-যার জায়গায় বসলে, বাঘেশ্বরী রাগিণীতে রায়বাঘিনীদের জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হল :

(রাগিণী বাঘেশ্বরী)

নীলাং অম্বরাং মেঘৈর্মেদুরাং নমামি তোমারে !
ঘটা-জালিকা মেঘমালিকা বায়ুরূপিকা
হে মা ধরণী জনম-দায়িনী !
জগজন-মন-মোহিনী, পশুপতি-শিশুপালিনী ত্বম্ ।

(কোরাস)

কলং জলং ফিড়িং ফড়িং
পী চক্ চক্ ফটিক জল !

মাথার উপরে আকাশ আরো নীল হয়ে উঠুক, নিশাচরদের সুখের রাত্রি নিরাপদ হয়ে থাকুক, মশার গুঞ্জন মাছির ভ্যান ভ্যান দিনে-রাতে শোনা যাক, পৃথিবীর বুকে কেঁচোমাটি কুণ্ডলী পাকিয়ে রমণীর খোঁপার মতো শোভা পাক, উইঢিপির কীর্তিস্তম্ভ মেঘও ছাড়িয়ে উঠুক—সুরে এমনি সব নানা প্রার্থনা জানিয়ে চাতকপাখি গান শেষ করার পূর্বেই সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—'বাজে বোকোনা, কাজের কথা কও, কাজ, কাজ, কাজ !' গাধা বলে উঠলেন—'ওহে পক্ষী, ঐ রাগিণীতে 'গা' আর 'ধা' দুটো সুরই তুমি একেবারে বাদ দিয়ে গেয়েছো ! ওটা ভুল হল, বাঘেশ্বরী ওতে ফুটলোই না !'

কান্দাহারের উট প্রস্তাব করলে—'যাতে করে মানুষ নিজের পায়ে হাঁটিতে শেখে ও হাঁটিতে শেখায় অভ্যস্ত হয় এবং ভবিষ্যতে বড় বড় জানোয়ারদিগের পৃষ্ঠে না ছওয়ার ঐতে পারে ঐরূপ একটা বন্দোবস্ত সভা ঐতে তুরন্ত যাতে করা হয়, আমি তাহার জন্য প্রস্তাব করিতেছি এবং সইভ্যগণের ও সভাপতির দৃষ্টি এবিষয় আকর্ষণ করিতেছি।'

সভাপতি ষাঁড় দেখলেন সত্যিই প্রস্তাবটা উট করেছেন মন্দ নয়, তিনি উৎসাহিত হয়ে উটকে ডেকে শুধোলেন—'এই ভালো কাজে সভা হাত দিলে তুরস্কের পেরু এবং কাফ্রিস্তানের উটপাখি এঁরা কিছু অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতি করতে রাজি কি না।' অস্ট্রিচ ও পেরু দুজনেই গম্ভীর মুখে চুপ রইলেন আর কান্দাহারের উট 'তোবা' বলে দুবার

ঘাড় নাড়লে, হ্যাঁ-না কিছুই বোঝা গেল না। শুয়োর উঠে বললেন—'মানুষগুলো যতদিন না বৈষ্ণব ধর্ম নেয় আর কসাইখানাগুলো বন্ধ হয়ে তাদের মধ্যে কেবল কুমড়ো বলি চলিত হয়, ততদিন জীবের দুঃখু ঘোচা শক্ত। ধর্মের নামে কেউ মারবে গরু, কেউ শুয়োর, কেউ পাঁঠা—এ হলে জীবের রক্ষা কোনোকালে অসম্ভব।'

বন-বরাহ ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন—'শুয়োর যা বললেন ঠিক বটে, কিন্তু কসাইখানার সঙ্গে আরো সব নানা জায়গায় নানা আবর্জনা মানুষেরা জীবকে দুঃখু দেবার জন্যে জড়ো করেছে, সেগুলো সম্বন্ধে কী বলেন?'

শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দুবার গলা খাঁকানি দিয়ে বরাহের কথার একটা কড়া জবাব দিলেন, এমন সময় সভাপতি ষাঁড় দুজনকে থামিয়ে বললেন—'যাক, ঘরে কে কী খায় না খায় সে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আপনাদের উচিত হয় না ঝগড়া করা।'

এইবার শৃগাল উঠলেন—এতক্ষণ তিনি কে কী বলে মন দিয়ে শুনছিলেন আর নোটবইয়ে টুকছিলেন—আঙুরের লতার মাচায় ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে শেয়াল আরম্ভ করলেন—'পূর্ব-পূর্ব বক্তারা যা বলে প্রস্তাব করে গেলেন, তারই সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলে আমি ক্ষান্ত হব, কিন্তু সেইসব প্রস্তাব নিয়ে নাড়াচাড়া করার পূর্বে আমি উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এ জীবনে আমি অনেক সভায় গিয়েছি, কিন্তু এমন একপ্রাণে একমনে ন্যাজ-নাড়া আমি কোথাও দেখিনি, দেখব না! মানুষের নিজের ন্যাজ নেই, তাই অন্যের ন্যাজ দেখলে তারা হিংসেতে জ্বলতে থাকে, মানুষ চায় সবাই তাদের মত নির্লজ্জ ন্যাজ-কাটা হয়ে থাকুক। কাজেই ঘোড়ার ন্যাজ তারা কাটে, কুকুরের ন্যাজও; গরুর ন্যাজ, ময়ূরের ন্যাজ কিছুই বাদ দেয় না।'

শেয়ালের কথা শুনে মুড়ো-ন্যাজ ডালকুত্তো চেঁচিয়ে উঠল—'ঠিক বলেছ দাদা—তোমাকেও তারা ছাড়ে না!' শেয়াল সে কথায় কান

না দিয়ে বলে চললেন—'এখন কাজের কথা হোক···সিংহের প্রস্তাব-মতো খাণ্ডব বনে একটা স্বতন্ত্র পশু-রাজত্ব স্থাপন করলে মন্দ হয় না, কিন্তু এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে, খাণ্ডব বন যুধিষ্ঠিরের আমলে যেমন ছিল এখন আর তেমন নিরাপদ নেই; প্রথমত জায়গাটা ভুরন্ত গরম, সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মধ্যিখানে, যেখানে গরমের দিনে 'লু' চলে। ছাগল ভেড়া খরগোস এমনি সব ছোট অথচ বড়দের বিশেষ কাজে লাগে এমন সব জন্তুরা সেখানে টিকতেই পারবে না, এর উপর সেখানে দাবানলের ভয় আছে, প্রায়ই খাণ্ডবদাহন হয়ে থাকে। কুকুর যে সহরে থাকারই প্রস্তাব করেছেন, সেটা আরামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মন্দ নয়। কিন্তু কুকুর চিরদিনই মানুষ-ঘেঁষা, এখনো খুঁজলে হয়ত তাঁর গলার কলারে একটা বেয়াড়া রকমের নাম দেখা যাবে!' কুকুর কথাটা শুনে ঘাড় চুলকোতে লাগল, হরবোলা পাখি সুর করে বললে—'কানকাটা না হলে কি মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতে হয় গা?' শেয়াল বলে চললো—'বাঘের তেজস্বী ভাষা শুনে আমারও একবার মনে হয়েছিল লেগে যাই কোমর বেঁধে লড়ায়ে! এক হিসেবে লড়াই মন্দ নয়—লড়ে বেঁচে আসতে পারলে। নয়তো কতকগুলো অনাথ অনাথা নিয়ে না-লড়ার দলকে বড় বিপদেই ফেলে যাওয়া হয়। ঘরে ঘরে অনাথ-ভাণ্ডারের চাঁদার খাতা গিয়ে ভদ্র জীবদের বড়ই বিপদ ঘটায়, কাজে-কাজেই বলতে হচ্ছে পুরোপুরি ভালো নয়, ওতে মন্দও মিশেল আছে, বিশেষ সত্যের জয় যে সব সময় তা নয়। শুয়োর যা বলেছেন তার মধ্যে ভালো-মন্দ তুই আছে, আর বরাহের প্রস্তাব হগসাহেবের বাজারের উন্নতির জন্যে তুলে রাখলে মন্দ হয় না। শুয়োর আর বরাহের কথায় যতই সার থাক না, রাজনীতি ক্ষেত্রে সেটা কোনো উপকারে আসবে না। কাজেই সকলে দেখছেন শান্তি কিংবা যুদ্ধ, অথবা সিংহের প্রস্তাব-মতো স্বতন্ত্রতা অবলম্বন—এ তিনই জীব-সমাজের সবার পক্ষে সমান ফল দেবে না। একথা একবাক্যে স্বীকার করতে

হবে যে, কোথাও একটা গোল আছে এবং সে গোলটা সিধে করা দরকার (সাধু, সাধু !)। আমি যে উপায় বাৎলাবো সেটা সম্পূর্ণ নতুন, আর এ পর্যন্ত পশু-সমাজে তার কোনো পরীক্ষা হয়নি (শোনো শোনো ! চুপ, চুপ !)—এস, আমরা সকলে জ্ঞানলাভের জন্যে উঠে-পড়ে লাগি—কেননা জ্ঞানের আর বিজ্ঞানের পথই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পথ, জ্ঞানাৎপরোতর নহি—মানুষেই এই কথা বলেছে। কেননা আমরা মানব জাতির ইতিহাস থেকে এটা শিখে নেবো, জাতীয় মহা-সমিতিতে থাকবে, আর থাকবে একটা মুখপত্র, যেখানে পরে-পরে আমরা নিজেদের অভাব অভিযোগগুলো জগতে বিশ্বসমাজের সামনে ধরে দিতে পারি, আমাদের আশা, উদ্যম, রীতি-নীতি, ঘরের কথা, বাইরের কথা সবই ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে সবার হাতে পড়বে।

'মানুষের মধ্যে যারা প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তারা মনে করে দু-একটা মরা জানোয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেআমাদের হাড়হদ্দ সবই জেনে নেবে, সেটা বড় ভুল। জানোয়ারের কথা এক জানোয়ারে লিখতে পারে—কিসে তাদের সুখ, কোথায় তাদের ব্যথা সে কেবল তারাই খুলে বলতে পারে, যাদের সুখ-দুঃখ আনন্দময় জীবনগুলো মানুষের চাপনে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে !' এইখানে আবেগে শৃগালের কণ্ঠরোধ হল, তিনি একটু আঙুরের রসে গলা ভিজিয়ে আবার শুরু করলেন—'আমাদের দুঃখ-কাহিনী আমাদেরই লিখতে হবে, সেজন্যে এখন থেকে প্রস্তুত হওয়া চাইই চাই।' শৃগাল উৎসাহের সঙ্গে আরো বলতে চলেছেন এমন সময় সভাপতি সভা-ভঙ্গের ঘণ্টা দিয়ে হঠাৎ মাঠের দিকে প্রস্থান করলেন—সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার প্রস্তাব হওয়ার আগেই অসময়ে সভা থেকে সবাইকে চলে যেতে হল, কোনো প্রস্তাবই সমর্থন, গ্রহণ কিংবা কিছুই হল না।

(ফরাসী হইতে চুরি)

বাবুই পাখির ওড়ন-বৃত্তান্ত

(নানান দেশের সামাজিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা)

তালচড়াই গুলোই বাবু খেতাব পেয়ে হয়েছে বাবুই পাখি। অন্য যেসব চড়াই পাখি ঘরে ঘরে সহরে দেখা যায় তাদের কেউ বাবুই বলে না। এই ভুলটা যে ঘটেছে তার জন্যে মানুষগুলোই দায়ী। বাবুই হচ্ছে তারা দেখতে যারা চড়াই কিন্তু আসলে সহর-ঘেঁষা এক জাতিরই পাখি; আর যেগুলোকে মানুষে বাবুই বলছে সেইগুলোই হল আসলে চড়াই পাখি। চড়া শক্ত এমন তালগাছের মট্‌কায় তারা থাকে বলেই তাদের তালচড়াই বলা হয় এ পক্ষীতত্ত্বটা সবাই জানে না বলেই গোল করে। মানুষে যাই বলুক কিংবা খেতাবের ওলোট-পালোটের দরুন পাড়াগেঁয়ে চড়াইগুলো আপনাদের বাবুই ভাবুন আর যাই ভাবুন, সহরের সাধারণ চড়াই যে অনেক বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে তালচড়াইদের চেয়ে তালগাছে না চড়েও উন্নত এবং বিদ্যে বুদ্ধি চটক ফটক সব দিক দিয়ে অগ্রগামী তা অস্বীকার করবার জো নেই, বাবুই যদি বলতে হয় সহরের দলকে বলাই ঠিক। তালচড়াইকে তাল ঠুকে বাবুই বলো আর যাই বলো তালচড়াই সে তালচড়াই-ই থাকবে চিরকাল তালগাছেই। আমি এই সৌখীন, সব বিষয়ে উন্নত, সহুরে বা মেট্রোপলিটন বাবুই পাখির একজন। ছেলেবেলা থেকে আমি চালাক চতুর, চটপটে, ফুর্তিবাজ বা বাবু-কছমের পাখি কিন্তু উচ্চশিক্ষার ফলে বেশ রাসভারী গম্ভীর-গম্ভীর গোছ দেখায় আমাকে। এর উপর একটু-আধটু কাব্য দর্শন সাহিত্য এমনি সব জিনিসের

ক্ষুদকুঁড়ো তাও আমি পরিপাক করতে বাকি রাখিনি—কেননা সব বিষয়ে দশকর্মা মহাপণ্ডিত এমন একজন মানুষের বাড়ির চিলের ছাতে একটা মেটে নলের ভিতর আমি বাসা নিয়েছি। সেখান থেকে আমি মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে বড় বড় রাজা-রাজড়ার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ঐশ্বর্যের অনিত্যতা, অসারতা আর আমার মেটে ঘরের প্রতিবেশীর ছোট বাড়িখানার মধ্যে যে উচ্চ চিন্তা আর সাধাসিধে জীবনযাত্রার অম্লান কুসুমগুলি দিনের পর দিন ফুটে চলেছে তার অমরতা উপলব্ধি করবার খুবই সুযোগ পেতাম। পণ্ডিতের পাতের ক্ষুদকুঁড়ো পেয়ে আমিও বাবুই সমাজে একজন মস্ত লোক বলে খ্যাতি পেলেম। কাজেই বাবুই সমাজটা কী প্রথায় চালালে সকলের সুবিধে হয় সেটা তদন্ত করবার ভার আমার উপর পড়েছে। কাজটা খুবই শক্ত, কেননা বাবুই পাখিরা যদি পাঁচজনে মিলে খালি স্থির হয়ে বসে বিবেচনা তর্ক-বিতর্ক করতো তবে আমি তাদের অভাব অভিযোগ শুনে যা-হয় একটা সুব্যবস্থা করতে পারতেম—কিন্তু তা হবার জো নেই। একদণ্ড তারা স্থির হয়ে বসে থাকতে চায় না, কেবলই চুল-বুল্ করে, বাজে কথা নিয়ে কিচিমিচি করা নয়তো অকারণে নিজে নিজে ঝগড়া মারামারি করাই তাদের কাজ ; কাজের কথা এলেই সরে পড়ে।

আজকাল বরং বাবুই দলে নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করবার একটু চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, আমি কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন এসব কিছুই ছিলনা, বাবুই তখন কেবলি উড়তো, নীতিচর্চা কিংবা ধর্মচর্চার ধার দিয়েও যেত না। এ পাড়ার চিলের ছাতের ওপর বাসাটা নেবার আগে ত্ব'বছর আমি একটা কাঠির খাঁচার মধ্যে বন্ধ ছিলেম। যখনই আমার তেষ্টা পেতো তখনই আমায় এতটুকু একটি দড়ি বাঁধা বোক্‌নো করে জল তুলতে হত। সবাই চড়াই পাখির জল তোলা দেখে ভারি আমোদ পেত আর কালো চাপদাড়িওয়ালা মানুষটা এই পাখির তামাসা দেখিয়ে যা রোজগার করত তা থেকে ত্ববেলা ত্বগুলি ছাতু ছাড়া আর বেশি কিছুই আমার জন্যে বন্দোবস্ত করত না। খাঁচা

ছেড়ে পালিয়ে পাড়ার দুচার জন আলাপী বাবুইকে যখন আমার দুঃখের কাহিনী জানালেম তখন সবাই আমাকে খুব আদর যত্ন করতে লাগলো। সেই সময়েই আমি বেশ করে নানা পক্ষীসমাজের চাল-চলন নজর করে দেখে নিলেম। আমি দেখেছি পাখিদের আনন্দ শুধু খাওয়ায়-দাওয়ায় নয়। বাবুই হোন চড়াই হোন সবার জীবনের একটা বড় দিক আছে। এমনি নানা দিকে নানা বিষয়ে নজর দিতে দিতে ক্রমে পক্ষীসমাজের মধ্যে আমি একজন মাতব্বর হয়ে উঠলেম। দিনের মধ্যে বেশি সময় আমি ময়দানের একটা পিতলের স্বর্গীয় অতিমানুষের মূর্তির উঁচু মাথার টাকটার মাঝখানে বসে উস্কো-খুস্কো পালকের মধ্যে মাথা গুঁজে, পৃথিবীর দিকের চোখটা বন্ধ করে আর আকাশের দিকের চোখটা খুলে রেখে পক্ষীসমাজের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কী ব্যবস্থা হতে পারে, কী বা এ সমাজের কাজ, আর কোথায় বা আমাদের শক্তি সে বিষয়ে চিন্তা করতেম। গভীর সমস্যা আমার মনে উদয় হত। বাবুই আর চড়াইয়েরা কোথা থেকে এলো, কোথায় বা যাবে; কেনই বা দুঃখু হলে তারা কাঁদে না, কেনই বা তারা কাকদের মত দল বেঁধে থাকে না, আর কেনই বা বাবুই আর চড়াই বাজে কিচিমিচি ঝগড়াঝাটি না করে পঞ্চায়েৎ করে সমাজের সব সমস্যা মিটমাট না করে নেয়!

দেখা যাচ্ছে সহরে ভারি অদল বদল হচ্ছে। যেখানে ছিল বাগান, সেখানে উঠছে বাড়ি, কাজেই সহরের যত বাবুই আর চড়াই তাদের কিড়িং ফড়িং পোকা ও মাকড় এমনি সব নানা খাবার জিনিসের ক্রমেই অভাব ঘটচে। এর ফলে মানুষদের মধ্যে বড়লোক আর গরিবের দুটো আলাদা থাক আর সঙ্গে সঙ্গে উঁচু নিচু একটা জাতেরও ছিষ্টি হয়ে উঠছে। শুধু যে মানুষের মধ্যে এমন হচ্ছে তা নয়, পাখিদের মধ্যেও গরিব-গুর্বো বস্তির পাখিগুলো ছাই-পাঁশ তাও আধপেটা খেয়ে মরছে আর বড়লোকদের পাড়ার পাখিগুলো ভালো খাওয়া পেয়ে খুবই আরামে রয়েছে। গির্জে, হাইকোর্ট, মনুমেণ্ট,

টেলিগ্রাফ, পোস্ট আপিস, গোলদিঘির টোল, কলেজ ইস্ট্রীটের গোলামখানা, হোটেল, হাঁসপ্পাতাল, এমনি সব বড়-বড় বাড়ির চুড়োয় বাসা বেঁধে সুখে আছে উচ্চে তারা। মানুষদের রাজত্বেও এই উঁচু-নিচু থাক-বেথাকের সৃষ্টি হয়ে পড়লে ক্রমশ ভারি গোলমাল মারামারি এমনকি রাজবিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটে। পক্ষীসমাজে তো একদিন এরূপটা চলা অসম্ভব। কতকগুলো পাখি খেয়ে খেয়ে মোটাবে আর দিব্যি আরামে ঘরকন্না করবে, আর কতকগুলো, তারা রাজ্যের ওঁচা সামগ্রী, তাও আবার আধপেটা খেয়ে দীনহীন অবস্থায় দিন গুজরান করবে এ তো হতে পারে না—ফলে দাঁড়ালো, বাবুইএর দলে গোল বাধলো। চড়াইরা মরিয়া হয়ে বললে—'আমাদের সামাজিক উন্নতির পথ যেমন করে পারি করে নেবো, এতে যদি ঠোঁটের চোঁচ চালাতে হয় তাও আমরা চালাতে প্রস্তুত।' যদিও আমি নিজে বাবুই বটে তবু সত্যি বলতে হবে চড়াইদের প্রস্তাবটা ভালোই। চড়াইরা দল বেঁধে মাস্‌চটকদের বাড়ির গলিতে এক চড়াইকে দলপতি করে এক বিরাট সভা ডেকে বসলো। এই দলপতির স্বর্গীয় প্রপিতামহের অতি-বৃদ্ধপ্রপিতামহ তিতুমিরের কেল্লা দখলের সময় ইংরেজদের বিশেষ সাহায্য করে চতুরজী খেতাব পেয়েছিলেন। এই সভার বিবরণটা দিই শোনো—

সকালবেলা সহরের অলিতে-গলিতে যত চড়াই সবাই দলে দলে ভাগ হয়ে টেলিগ্রাফ আপিস, হাইকোর্ট, গ্র্যাণ্ড হোটেল এমনি সব বড় বড় জায়গা দখল করে বসল। প্রধান দল গিয়ে চারিদিকে যত বড় গাছ ছোট গাছ দখল করে ফেললে। সহরের লোক তো এই চড়াই পাখির ঝাঁক দেখে অবাক! বাবুইগুলো ভেবেই অস্থির, বুঝিবা এবার অন্ন যায়। এই ভেবেই সব বাবুই একত্র হয়ে যা-হয় একটা মিটমাটের চেষ্টায় আমাকে ডেকে দূত করে চড়াইদের সভায় পাঠালেন। আমার জীবনের সেই দিনটা আমার পক্ষে অতি গৌরবের দিন। সব চড়াই আর বাবুই যখন আমার মুখ চেয়ে বসে, সেই সময়

আমি আপনাকে বড় ভাগ্যবান বলে ঠাওরালেম। যা হোক, দুই দলে মিলে যাতে একটা উপায় হয় তার ব্যবস্থার ভার আমাকে দিলেন। বড় বড় চড়াইদের আর বাবুইদের মধ্যস্থ হয়ে আমায় কাজ করতে হল। কী করে সব দিক রক্ষে হয়, তাই নিয়ে দুপক্ষ থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল বাঁচা যায় কী করে, খাওয়া যায় কী করে, সহরের সব বড় বড় জায়গাগুলো কি বাবুইদের একচেটে থাকবে, না জাতিভেদ উঠিয়ে দিয়ে চড়াই আর তালচড়াই দুজনের মধ্যে জল চলাচল হবে, আর তাই যদি হয় তবে কী নিয়মে ভবিষ্যতের সমাজ-বন্ধনটা করা সুবিধে—এমনি সব বড়-বড় প্রশ্ন আমাকে মেটাতে অগ্রসর হতে হল। শেষে প্রশ্ন উঠলো—মুড়ি মিছরির এক দর হোক। এতে সব বাবুই আপত্তি করলেন—'আমরা সহরে থাকি—এ হলে সব চিনি বাইরে যাবে। একে তো সহরের আবহাওয়া ফাঁকার মতো ভালো নয়, তার উপর মিছরি না পেলে আমরা কী সুখে বাঁচি? চড়াই তাঁরা পাড়াগাঁয়ে থাকেন—কিড়িং ফড়িং যথেষ্ট, সেখানে মুদির দোকানের মুড়িমুড়কিও প্রচুর, তার উপর ফাঁকা হাওয়া যথেষ্ট—এ আব্দার করা তাঁদের অন্যায়, এতে আমরা কিছুতেই রাজি হবো না!

অমনি চড়াইয়ের দল ভয়ানক কিচিমিচি আরম্ভ করলেন, দুই দলে বকাবকি শুরু হল। মানুষরা হলে সেদিন একটা বিদ্রোহ আর রক্তপাত না হয়ে যেত না, কিন্তু পক্ষীসমাজে গোলমাল চেঁচামেচি থেকেই ভালো ফলের উৎপত্তি ধরা যায়। হলও তাই, দুই দলে শেষে একত্র হয়ে আমাকে নানা জন্তু-সমাজের নিয়ম কানুন আচার ব্যবহার-গুলো বেশ করে খুঁটিয়ে দেখে আসতে পাঠালেন। আমি সেই দিনই কার্যের ভার নিয়ে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেম। সমাজের কল্যাণের জন্যে কী না ত্যাগ করা যায়? তা ছাড়া কাজটা খুব সম্মানের কাজ, আর রোজগারও কিছু সেইসঙ্গে ছিল।

* * * *

এখন দেশের জনসাধারণের সভায় আমি আমার সমাজ সম্বন্ধে

রিপোর্ট ক্রমশ দাখিল করবো—প্রতিমাসে 'বেণু' কাগজে ; সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে রাজি হইয়াছেন, নিজ খরচায়।

(পিঁপড়েদের ক্ষুদে সমাজের সঠিক ইতিহাস)

এখন যেমন কলের জাহাজ উড়ো জাহাজ হয়েছে, তখন এসব ছিল না—সদাগরের জাহাজ আর বোম্বেটে জাহাজই চলত বড় বড় পাল তুলে। আমি এরই একটা জাহাজের মাস্তুলে চড়ে পিঁপড়েদের ক্ষুদে সহরের দিকে রওনা হলেম, কালাপানি পার হয়ে। সিন্ধবাদ থেকে রবিনসন ক্রুসো যারাই সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তাদেরই নানা বিপদ আপদ ঘটেছে, আমাদেরও জাহাজ নানা বিপদ কাটিয়ে কখনো বোম্বেটেদের হাতে পড়ে, কখনো অসভ্যদের হাতে পড়ো-পড়ো হয়ে, কখনো জলের তলাকার পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে প্রায় ফুটো হয়ে, একটা ঢাউস তিমি মাছের ন্যাজের ঝাপটা খেয়ে প্রায় কাত হয়ে একটা বন্দরে ঢুকল। সেখানে একজন কাটপিঁপড়ে বসে ছিলেন, তাঁর মুখে শুনলেম এইটেই পিপ্‌লা বন্দর এবং পিঁপড়েদের ক্ষুদে সহরও একটু আগেই আছে। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি দেখে আমি তাড়াতাড়ি জাহাজের মাস্তুল ছেড়ে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে বাসা নিতে চললেম। গরমের দিনে রোদ ঝাঁঝাঁ করছে, বৃষ্টি হয়-ই না দেশটাতে, কালে-ভদ্রে এক-আধ দিন যদি দু-একটা শিল পড়ে তো লোকগুলো সে-কটা জমা করে বরফজল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়।

পথে দেখলেম দলে দলে পিঁপড়ে, তারা কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ হাওয়া খেতে চলেছে, পুরুষদের সবাই আগাগোড়া কালো বনাতের কোট প্যাণ্ট হ্যাট আর বার্নিশ করা জুতো পরে। এই গরমে বনাতের কাপড় সয় কেমন করে এদের বুঝলেম না ; আর এদের সবারই কি এক সাজ এক ঢঙ! মিশকালো মোটা বনাতের কাপড় পরা দেখে জানলেম এরা ডেঁয়ে পিঁপড়ে, জলে স্থলে ঘাটে মাঠে ঘরে বাইরে সব জায়গায় সব সময়ে এরা ফিটফাট হয়ে চলাচল করছে—

গোঁফের আগা থেকে পায়ের বুট পর্যন্ত কোথাও সাদা নেই, চক্‌চক্‌ করছে কালো। আমার মনে হল বাইরেটায় এদের হয়ত যত চক্‌মকানি ও কালোর বার্নিশ, ভিতরে হয়ত নেহাৎ সাদা এরা। এই না ভেবে একটা পিঁপড়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধোলেম্—'আচ্ছা, যদি তুমি এতটা ফিটফাট হয়ে না বেড়াও, কিংবা সাধাসিধে এই আমার মতো ধুতি-চাদরে বেশ বাবু সাজো তো পিঁপড়ে সমাজে তোমার কি মানের হানি হবে?' পিঁপড়েটা আমার কথার জবাবই দিলে না, গোম্‌সা মুখে গটগট করে অত্যন্ত রাগত ভাবে চলে গেল। পড়ে জানলুম কেউ মাঝে পড়ে আলাপ পরিচয় না করিয়ে দিলে এরা কারুর সঙ্গে কথা বলা বেদস্তুর মনে করে ভারি চটে।

থাকতে থাকতে প্রবাল দ্বীপের ইন্দ্রগোপ কীটের সঙ্গে আমার আলাপ হল। লাল মূর্তি, মস্ত গোঁফ—তিনি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের একপলা রাজত্বের পত্তন দিচ্ছিলেন, এমন সময় মাছ ধরার জাহাজে করে পিঁপড়েরা ফৌজ পাঠিয়ে তাঁকে বন্দী করে এনেছে। তাঁরই মুখে পিঁপড়েদের রাজত্বের অনেক খবর পেয়েছি। তিনিই বললেন, পিঁপড়েদের রাজা তাঁর প্রজাদের হুকুম দিয়েছেন, যেখানে যত প্রবাল-দ্বীপ সাত সমুদ্র তের নদীর মধ্যে দেখা দেবে সেগুলোকে পিঁপড়ের রাজ্যের সামিল ক'রে নিয়ে এক একটা উপনিবেশ বসাতে। এটা অতি গোপনীয় খবর—সুতরাং কাউকে যেন বলা না হয়।

বন্দর থেকে একটু যেন পা বাড়ানো, অমনি একদল নতুন ধরনের পিঁপড়ে আমাকে এসে ঘেরাও করলে। শুনলুম তারা কাস্টম পিপীলিকা। তাদের কাজ—যে-কেউ এ দেশে পা দেবে তাকে কষ্ট ভোগানো—পোঁটলা পুঁটলি খুলে দেখা, চোরাই মাল কিংবা আর কিছু লুকিয়ে বিক্রি করতে এখানে আসছে কি না এরই তদারক করতে গিয়ে এটা-ওটা হারিয়ে দিয়ে নিজের পকেটে পোরা এবং শেষে আবার যার জিনিস তাকেই মাল সরিয়ে ফেলার দরুন দণ্ড করা ও নানা ভোগ ভোগানো কাজে বেশ মোটা মাইনে পাচ্ছে এরা।

এই দেশের এরা নিজেদের ছাড়া জগৎসুদ্ধুকে কী চোখে দেখে তা এদের দেশে পা দেবামাত্র বুঝলেম। সব দেখে শুনে যখন কোনো চোরাই মাল এরা আমার পালঙ্কে তোষকের মধ্যে কিংবা ডানার ভাঁজে কোথাও খুঁজে পেলে না, তখন এরা জোর করে আমার দুই ঠোঁট চিরে দেখতে লাগল দুরবীন দিয়ে—গলার মধ্যে করে এদের দেশে আমি লুকিয়ে কিছু আমদানি করেছি কি না। যখন দেখলে আমি খালি চড়াই বই আর কিছু নই, তখন এরা বেশ কিছু ঘুস নিয়ে আমাকে তাদের ক্ষুদে সহরে যাবার হুকুম দিয়ে ছেড়ে দিলে। শ্বেত কাকের কথা শুনে পিঁপড়ের দেশ দেখতে এসে প্রথমটাতেই বড় জ্বালাতন হতে হয়েছিল।

দেখলেম, এরা রাজারাজড়া থেকে কুলিমজুর পর্যন্ত খেটে খেটে মরে শখ করে ; বাবুয়ানার দিক দিয়ে যেতেই চায় না। এদের দেশে শখের জিনিস যথেষ্ট—ভালো ফল ফুল সবই আছে, কিন্তু নিজেরা এরা সেগুলো ভোগ করতে চায় না একেবারেই। যেদিকে যাই, দেখি দলে-দলে পিঁপড়ে মালপত্তর রসদ পিঠে করে নামাচ্ছে, ওঠাচ্ছে। মিস্ত্রি মজুর তারা মাটির নিচে সব সুড়ঙ্গ চালিয়ে পথ করে দিচ্ছে। পৃথিবীর উপরকার ভার কমাতে সবাই এত ব্যস্ত যে আমাকে দেখেও দেখলে না।

দেখলেম, এদের মধ্যে একদল আছে তারা দালাল পিঁপড়ে। তারা কোথায় কী মাল আছে তার সন্ধানেই ফিরছে। আর এক দল, তারা যেখানে যা পাচ্ছে কুড়িয়ে নিয়ে জমা করছে। অন্য দল তারা খুব লুকোনো জিনিস তারই সন্ধানে গিয়ে রাতারাতি, এমনকি দিনে-ডাকাতিও করে আসতে ছাড়বে না। এরা নুন ছোঁয় না—কাজেই নিমকহারামি বলে একটা কথা নেই এদের অভিধানে। মুখমিষ্টি জাত বলে এরা জগৎবিখ্যাত। চিনি কিংবা চিনি না, এই দুটো কথা এরা ভারি মান্যি করে। তাই যাকে চিনি না বলে মনে করে এরা, চেনা-চিনি হলেও ফস্ করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। এতে

করে জগৎসুদ্ধুই এদের কাছে অপরিচিত ; এক চিনির পুতুলগুলিকেই এরা একটু খাতির করে চলে।

এদের ধর্ম আমি যা দেখলেম তাতে এদের ঘোরতর পৌত্তলিক বলতে হয়। এরা ঘরে ঘরে এক-একটা লোহার সিন্দুকের আকারে ছোট-বড় মন্দির খাড়া করে সেখানে সোনা রুপো কোম্পানির কাগজের সিংহাসনে চিনির শেয়ার বলে একটা হাজার হাত মূর্তির পুজো দেয় কেবলই। এই দেবতা কখনো এদের ভক্তিতে বিগলিত হন। তখন মুস্কিলে পড়ে পিঁপড়েরা। ভক্তিতে আটকা পড়ে পালাতে পারে না, চিনির সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মারা যায়।

এই দেবতার আর-এক নাম হচ্ছে 'বাত্-আশা'। ঠিক বলতে পারিনে এটার কী অর্থ, শব্দকল্পদ্রুমে লিখেছে যে 'বাত' অর্থের মুখের কথা এবং 'আশা' কি, না আশা। এই থেকে এ কথার উৎপত্তি।

এইসব ব্যাপার দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি কতকগুলি পিঁপড়ে পালক নেড়ে যেন উড়ে উড়ে চলেছে। একটা পাহারাওয়ালা পিঁপড়েকে শুধোলেম—'এরা সব দেখি কাজকর্ম করছে, আর ওরা জমকালো চারখানা পালকের ধড়াচুড়ো এঁটে নিষ্কর্মার মতো রয়েছে কেন?' পাহারাওয়ালা বললে—'এঁরা হচ্ছেন দেশের আমীর ওমরা, নেতা অধিনেতা, অধিরাজ,—রাজা মহারাজাও বললে চলে ; খুব পুরোনো বংশের ঘুন পিঁপড়ে এঁরা।' আমি আবার শুধোলেম—'ঘুন পিঁপড়ে কাকে বলে?' পাহারাওয়ালা বললে—'এঁরা হলেন দেশের মাথা, আজন্ম এঁরা পালকের গদি আর পালকের সাজসজ্জা করে থাকেন। সুয্যির আলো না দেখা দিলে ঘর থেকে বেরোন না, পাছে ভিজে আর চক্‌মক্ না করে। আঃ! এঁরা বড় আরামেই থাকেন ; এক দুঃখ—এঁদের অকাজে দিনগুলো কাটাতে কাটাতে এমন অরুচি হয় যে ভেবেই পান না কী নিয়ে বেঁচে থাকেন। কেবলই তখন শুনি এঁরা বলেন—দিন যে যায় না কী করি!'

এইসব পালকের গদিতে গদিয়ান ওড়ম্বা পিঁপড়েদের বিষয়ে একটু

জানবার ইচ্ছে হল আমার। কেননা দেখলেম এরা যেন একটু সৌখীন গোছের এবং বাবু কছমের, কিন্তু খবর নিয়ে জানলেম এদের ঘরে এরা কিছুই জমা করে না; দোকানঘরের উপরে একটু বাসাটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এরা থাকে কাচ্চাবাচ্চাদের শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে। কোনো কিছুতে এদের মন নেই, কেবল কতগুলো ওড়স্বার দলে ঘুরে ঘুরে মরে এরা। এদের বুদ্ধি না-মোটা না-সূক্ষ্ম, কেমন একটা বেঢক গোছের। নিষ্কর্মার ধাড়ি বলে এদের সবাই জানে।

আমাদের কথা হচ্ছে, এমন সময় এক পালক-ওঠা পিঁপড়ে সেইদিক দিয়ে চলে গেল; পাহারাওয়ালা আর মিস্ত্রি মজুর পিঁপড়ে-গুলো দুধারে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। পিঁপড়ের রাজত্বে দেখছি সচরাচর পিঁপড়েগুলো অত্যন্ত গরিব, জমিজমা যা কিছু সবই ঐ পালক-ওঠা পিঁপড়েগুলোই দখল করে বেশ ছোটো-খাটো এক-একটি পাহাড়ের মত পিঁপড়ের ঢিবি বানিয়ে সুখে আছে। এইসব সৌখীন পিঁপড়েদের জন্যে দেখলেম, বড় বড় বাগানে সব পালে পালে মাছি পোষা রয়েছে, তারা সেগুলোকে মাঝে মাঝে শিকার করে—আমোদও পায়, পেটও ভরায়। গরিব পিঁপড়েরা দেখলেম তাদের রাজ্যের ছানাপোনাগুলির ভারি আদর-যত্ন করে থাকে। ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষার খুব ভালো বন্দোবস্ত করেছে দেখলেম। আর আমার মনে হয় এইজন্যেই পিঁপড়ে জাত এত বড় হয়েছে। এক-একটা বাড়িতে দেখলেম ছেলের পাল—ষষ্ঠীতলার ঘেটের বাছার দল তারা।

একধারে দাঁড়িয়ে আমি এসব চিন্তা করছি এমন সময় এক জাঁদরেল-গোছের পিঁপড়ে দেখলেম একটা ঢিপির উপর উঠে হাত পা নেড়ে আর পাঁচজনকে কি হুকুম দিলে—অমনি দেখলেম দলে দলে পিঁপড়ে-ফৌজ কেল্লা ছেড়ে খড়কুটো, পাতার ভেলা ভাসিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলল। শুনলুম কোথায় একটা লড়ায়ে এদের হার হবার জোগাড় হচ্ছে তাই আরো সৈন্য সেখানে যাচ্ছে। দুই জাঁদরেল পিঁপড়েতে কথা হচ্ছে দেখে আমি কান পেতে শুনে খবর পেলুম কোনো

এক দেশের ছারপোকারা নাকি কতকালের উই-ধরা পুরোনো একটা রাজতক্তের তলায় সুখে অনেক কাল বাস করছিল আশি যুগের রাজাদের গায়ের রক্ত খেয়ে খেয়ে! সেই অপরাধে নাকি খটমল দেশটাকে উজোড় করে দিয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যেই এরা অগ্রসর হচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে জাঁদরেলদের বললুম—'খটমল দেশের গোটাকতক ছারপোকাকে শাসন করতে গিয়ে আপনাদের একে তো যথেষ্ট খরচ হবে, তা ছাড়া সেখানে বনে জঙ্গলে কষ্ট পেয়ে অনেক পিঁপড়ে মারাও যেতে পারে।'

তাঁরা দুজনেই বললেন—'বিশ্বের কল্যাণের ভার যখন আমরা নিয়েছি তখন কিছু তো ত্যাগ স্বীকার করা চাই, তা ছাড়া আমাদের সৈন্যগুলো নিষ্কর্মা থেকে থেকে ক্রমে লড়াই করা ভুলেই যাচ্ছে। আর খটমল দেশটাও শুনেছি খুব বড় দেশ—সেখানে ছারপোকাগুলোর রক্তেও অনেক চিনি আছে। শুষে নিতে পারলে বেশ আয় আদায়ের সম্ভাবনা। এই লড়াইটাতে যত খরচ তার দশগুণ লাভ নিশ্চয়ই আমরা করে নিতে পারব।'

আমি এখন খটমল দেশটাকে একবার দেখে নেবার আশায় জাঁদরেলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে বিনা ভাড়াতে যুদ্ধজাহাজে চড়ে খটমল রাজত্বের দিকে চলে গেলেম।

জাহাজ তো নয়! দেখলেম যেন একটা কেল্লা। পল্টনে ঠাসা, বারুদ গোলাগুলি আর বন্দুকে ভর্তি। দেখে আমার ভয় হল, যদি এক ফুলকি আগুন কোন রকমে লাগে তো রক্ষে নেই। ভয় হল, এ জাহাজে চড়ে পড়াটা ভাল হল কি না। ভাবছি, এমন সময় লালমোহনের সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর কঞ্চি কাগজের বিশেষ সংবাদ-দাতা হয়ে খটমল দেশে চলেছেন একটা লাল খাতা হাতে।

এক যাত্রায় পৃথক ফল ভালো নয়—এটা শাস্ত্রের কথা, কিন্তু আমার মনে হল যে দুজনে একই কাজে খটমল দেশে না গিয়ে তিনি যান এই বারুদ-ঠাসা জাহাজটায় সেখানে, আর আমি চলি পথের

মাঝে যে মৌচাক রাজত্বটা আছে মধুবনে, সেখানের খবরাখবর আনতে। তা ছাড়া দেখলেম লাল পল্টনের একটা কাপ্তেনের সঙ্গে লালমোহনের মোহনবাগান ক্লাবে ভাবসাব আছে। কথাও কয় লালমোহন ওদের ভাষায় আমার চেয়ে ভালো। সুতরাং খটমল দেশের ভার তাকে দিয়ে আমি যুদ্ধজাহাজ ছেড়ে 'মধুকর' বলে একটা দেশি কোম্পানির ইস্টীম-জাহাজে মৌচাকপুরের দিকে চলে গেলাম।

(মৌমাছিদের রাজতন্ত্র)

মৌমাছিদের রাজতন্ত্র সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং থিসিস লিখতে হবে জেনেই আমি আমাদের তালতলীর লাইব্রেরি থেকে তালপাতায় এবং ছাপা কাগজে ইস্তক নাগাত মৌমাছি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে সংগ্রহ করে বেরিয়েছিলেম মৌচাকপুরের তথ্য সংগ্রহ করে আনতে, সরেজমিনে original research করাই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বিধাতার চক্রে উই-পোকার উৎপাতে তালপাতার পুঁথি ও ছাপা বই সমস্তই একেরাত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল কাজেই স্বচক্ষে দেখে যা পারি তাই নোট করে পাঠালেম—এ ছাড়া আর একটা দুর্ঘটনা ঘটল তাও বলি—

মৌচাকপুরে খবরের কাগজ নেই, ভৃঙ্গদূত আছে। তারাই মুখে দেশবিদেশের খবর নিয়ে আসে। মধু মোদকের দোকানঘরই হল এখানের পোস্ট অপিস, সেখানে মিষ্টি মিষ্টি কথায় গুন গুন করে শুনিয়ে চলে খবর ভৃঙ্গদূতেরা একে একে। দেশের খবর অনেকদিন পাইনি কাজেই মৌচাকপুরে পৌছেই ছুটলেম মধু মোদকের আড্ডায়। সেখানে চায়ের বদলে মধু আর মোমাই-রুটি খেয়ে বসে গেলেম দেশের খবর নিতে।

আহমদাবাদ জলে ভেসেছে, দামোদরের বাঁধ ভাঙো-ভাঙো, চৌরঙ্গীর ব্রজনাথকে কলকাতার পুলিশ রাতারাতি সিংহাসনচ্যুত করেছে, জেন্ত-সভার অনুকরণে কলকাতায় এক দল একটা সভা খুলে বসে পুরোনো ঘি জমি থেকে উদ্ধারের চেষ্টায় অজস্র অর্থ ব্যয় করেছে

—শোনা যাচ্ছে সেই ঘিয়ে তারা নতুন রকম মৃতসঞ্জীবনী ওষুধ বানিয়ে মানুষকে অমর করবে এই মতলব। কথাটা শুনে চিন্তা উপস্থিত হল, ঠিক সেই সময় ভ্রমর-দূত এসে খবর দিলে তালবনীতে বিষম কাণ্ড হয়ে গেছে, একটা মানুষ তালগাছে চড়ে বাবুই পাখির যে-কটা বাসা এবং সংসার ছিল একরাত্রে কাচ্চাবাচ্চা-সমেত লুট করে পালিয়েছে, চিহ্নমাত্র নেই বাবুইপাখির।

আমি এই খবর শুনে তখনই বিশেষ সংবাদদাতা একজনকে পাঠালেম জেন্ত-সভায়, পুনরায় সংসার পাতবার জন্যে অর্থসাহায্য চেয়ে। কিন্তু জেন্ত-সভা বললেন আমাকে রিলিফ কমিটিতে আবেদন করতে, রিলিফ কমিটি বললেন কংগ্রেস কমিটিতে প্রস্তাব আনতে। এমনি ঘোরাঘুরিতে হয়রান হয়ে আমি কর্ম পরিত্যাগ করে নতুন চাকরির সন্ধানে দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং জেন্ত-সভার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়েছি ও কবিতা লিখতে অগ্রসর হয়েছি। কথিত সম্পাদকের কাছে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করব বলে ইচ্ছা ছিল কিন্তু মৌমাছি সম্বন্ধে মানুষ এত লিখেছে যে তার তর্জমা দিয়ে কোনো লাভ দেখি না সুতরাং এবার থেকে original কবিতাই দেব। লেখা ও সুর সবই original এবং বিনা অনুমতিতে পুনর্মুদ্রণ হইবে না জানিবেন! পুষ্পবনের মধ্যে মক্ষীরানী মোমতাজ মহল বানিয়ে বাস করেন, রানী মক্ষী মোমের পুতুলী ; ইনি অতি বুদ্ধিমতী ; মৌচাকে মধু জমা করতে এঁর মতো জুটি নেই। তা ছাড়া বাদলা দিনের আগেই ইনি সাবধান হতে জানেন, আর বিদেশেও ইনি কতক-কতক মধু জমা করেছেন।

এক নবাবপুত্তুর মধুপুর থেকে একটি মধুমুখী কন্যাকে বিয়ে করতে চান, তিনি এসে মধু মোদকের দোকানে খবর চাইলেন, বিয়ের যুগ্যি কোনো রাজকন্যে এখানে পাবার সম্ভাবনা আছে কি না। মুদি তাঁকে সেলাম ঠুকে বললে—'কুমার বাহাদুর, আমাদের রানীর এক মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে যে—যান, যদি ঘটকালি করে সম্বন্ধ

করতে চান তো এইবেলা। আপনাকে দেখতে শুনতে ভালো, গায়ের জামাগুলো নতুন হলেই বেশ বর-বর দেখাবে।'

এদের রাজকন্যের বিয়ের ধুমধামটাও আমার দেখার সুবিধে হয়ে গেল। কালো আর হলদে কাপড় পরে আটজন বাজিকর মক্ষীরানী পুরোনো বাড়ি মোমতাজপুর ছেড়ে বার হল। এদের পিছনে আর পঞ্চাশজন গড়ের বাজি-বাজিয়ে; এমন তাদের সাজ ঝকঝকে, মনে হল যেন হিরে মানিক জ্যান্ত হয়ে বেরিয়েছে। তারপর এল মাথাটার হুল আর শূল উঁচিয়ে বরকন্দাজ মাছি, তারা প্রায় দুশো হবে—কাতারে কাতারে বার হল—আগে আগে তাদের সর্দার বুকে মোমতাজ-পুরের একটা মোমের তক্‌মা ঝুলিয়ে। তারপর সব রানীর ঝাড়ুবর্দার, আগে আগে ঝাঁটার কাঠির ঝাড় উঁচু করে তাদের জমাদার। তারপর এল খড়কেধারী, আর বাসনমাজুনী সঙ্গে আট ক্ষুদি দাসী, কেউ মধুর বাটি, কেউ খড়কে কেউ পান কেউ চিনি এমনি সব নানা সওগাত বয়ে; তারপর এলেন রানীর প্রিয় দাসী তসরের কাপড় মসমস করে, সঙ্গে বারোজন ছোটবড় সেবাদাসী; সবশেষে বার হলেন কন্যে জরি কিংখাপের ওড়নায় সেজে—এই ওড়না কেবল শোভার জন্যে, ওড়বার কাজে কোনদিন লাগবে না। কন্যার পাশে দেখলেম তার মা মক্ষীরানী, মোটাসোটা, আগাগোড়া মখমলে আর হিরের টুকরোয় সাজানো, রানীর পিছনে পিছনে একদল মধুকর বিয়ে উপলক্ষে বাঁধা গান গাইতে গাইতে চলেছে ঐকতান বাজির সঙ্গে। তার পরেই বারোজন বুড়ো মাছি গুনগুন করে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে বেরিয়ে এল। এরাই হল আচার্যি, পুরিৎ, ঘটক, এমনি সব। রানী এসে বাইরে দাঁড়াতেই দশ-বারো হাজার মাছি তাকে ঘিরে দাঁড়ালো, রানী তাদের একটা বক্তৃতা শোনালেন—'প্রজাগণ, তোমাদের যখনি উড়তে দেখি তখনই আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়। কেননা, তোমাদের ওড়া মানে এই মোমতাজপুরে দেশবিদেশের মধু ক্রমে জড়ো হওয়া ও রাজ-সংসারের সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাওয়া। প্রজাপতিও ওড়ে বটে—'এই সময়

এক বুড়ো আচার্যি, বিয়ে উপলক্ষে প্রজাপতির সম্বন্ধে কটাক্ষ করলে রাজোচিত কাজ হবে না—কানে-কানে বলে দিলে রানী সামলে নিয়ে বললেন—'প্রজাপতিকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি এই পৃথিবীকে মধুভরা ফুল দিয়ে ছেয়ে রেখেছেন। আমার বিশ্বাস মোমতাজপুরের প্রজারা অপব্যয় না করে সেই মধু এই রাজদরবারের কল্যাণসাধনের জন্যই জমা করবেন আর সেই কল্যাণের ফলে প্রজাপতির আশীর্বাদ লাভ করে সুখে থাকবেন। তোমরা রানীর কল্যাণ করতে কোনদিন ভুলো না—কিসে তাঁর আয় বৃদ্ধি, মান বৃদ্ধি ও সুখসমৃদ্ধি বাড়ে তারই চিন্তা যেন সর্বদা তোমাদের ব্যস্ত রাখে আর একথাও তোমাদের ভুললে চলবে না যে মোমতাজপুরের রাজত্বটা তোমাদের অচল রাজভক্তির উপরেই অটল থাকতে পারে।

'ধর্ম এবং রানী এই দুয়ের জন্যে প্রাণ না দিলে তোমাদের রাজ্য একদিনও বাঁচতে পারবে না এটা নিশ্চয়। রানীর চলবে না তোমাদের ছাড়া, তোমাদেরও চলবে না রানী না হলে, সেই বুঝেই আমি আমার এই মোমের পুতুলী মেয়েটিকে তোমাদের রানী করে দিলেম, এঁকে তোমরা যত্নে রাখো সুখে রাখো এই আমার ইচ্ছে।'

রানীর বক্তৃতা শুনে প্রজা মৌমাছি সব আনন্দধ্বনি করতে লাগল। নতুন রানী সমবয়সী মৌমাছিদের সঙ্গে একদিকে আমোদ আহ্লাদ করতে চলে গেলে পর নবাবপুত্তুর বুড়ো রানীর কাছে গিয়ে বললে—'রানীমা, প্রজাপতি আমাকে মধু সংগ্রহ করবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি কিছুই দেন নি। কিন্তু আমি বেশ গুছিয়ে সংসার করতে মজবুত। যদি অল্পসল্প যৌতুক আর দানসামগ্রী দিয়ে কোনো একটা কালোকোলো মেয়েকে পার করবার ইচ্ছে থাকে তবে আমি খুশি হয়ে তাকে নিতে রাজি আছি। আর—'

রানীর প্রিয় সখী তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল—'রাজকুমার, তুমি জানো না—এ দেশের রানীর সোয়ামীর কপাল বড়ই মন্দ হয়। তাকে এরা একটা উৎপাত বলেই মনে করে আর সেইজন্যে আদর-

যত্নও করে না, রাজকার্যে তার কোনো কথা চলে না এবং কতকটা বয়সের বেশি আমরা তাকে কিছুতে বাঁচতে দিই নে। কাজেই ভেবে দেখ এ দেশের রানীর জামাই হতে চাও কি না।'

বুড়ো রানী বলে উঠলেন—'কোনো ভয় নেই, আমি তোমার পক্ষে রইলেম, তুমি আমার কাছে থাকো। তুমি দেখছি বড়-ঘরের ছেলে, আর তোমার মন যখন হয়েছে তখন আমার এক মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো, তুমি আমার রাজত্বে ভালোই করবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে। এস।'

যতো নবাব একেবারে নির্বুদ্ধি ছিল না। সে বেছে বেছে সবচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যার প্রেমে পড়ে গেল। অজানা মৌমাছি সে কোন্ দেশ থেকে উড়ে এসে সুন্দরী মক্ষীরানীর কন্যের রূপের আলোর মধ্যে ঘুরে ফিরে কন্যের সঙ্গে এক ফুলে মধু খেয়ে ছায়ার মতো তার পিছে পিছে ফিরে শেষে তার হৃদয়টি অধিকার করে নিলে। মৌমাছির প্রেমের এই বিচিত্র ইতিহাস মনে করলেও এখন আমার নিজের বিয়ের দিনগুলি যেন চোখের সামনে উদয় হয়। আমার মনে হয় মৌমাছি আর মানুষের ভালোবাসার তত্ত্বটা তলিয়ে দেখবার জন্যে পশুসমাজ থেকে একটা বিশেষ কমিশন বসানো দরকার।

আপনারা শুনে সুখী হবেন, আমার নাম এদেশে এমন প্রচার হয়েছে যে রানীর ওখান থেকে আমার জন্যে একটা বিশেষ মজলিসের নিমন্ত্রণ চারিদিকে পাঠানো হয়েছে। কার্ডে লেখা হয়েছে—সম্ভ্রান্ত বিদেশীকে অভ্যর্থনার জন্য রানীর হুকুমে সকলে এরা মধুপানাদি করবে। যা-হোক রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছি—দরবারের দেউড়িতে জনকতক হোমরা-চোমরা মাছি এসে আমাকে বেশ করে দেখে শুঁকে স্থির করে নিলে এমন কোনো বিদেশী গন্ধ আমার ভিতরে বাইরে আছে কি না যাতে করে সভাটা নোংরা হতে পারে।

আমাকে খরচ করে তারা সভায় হাজির করলে পর মৌচাকেশ্বরী এসে এক ফুলের সিংহাসনে বসলেন, আমি নমস্কার করে বললেম—

'মহারানী, আমি একজন বাবুই দর্শনসভার প্রধান সদস্য। জেন্তু-সভার পক্ষ থেকে নানা রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের হিসেব জোগাড়ে নিযুক্ত হয়ে বেরিয়েছি।' মহারানী হেসে বললেন—'আপনি অতি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার দিন কাটানো ভার হত যদি না রাজ-কাজ থেকে বছরে দুবার করে আমাকে ছুটি নিতে না হত। আমাকে মহারানী বলবার কোনো আবশ্যক নেই, রাজনন্দিনী কিংবা মক্ষী বললেই আমি খুশি হব।'

আমি বললেম—'রাজনন্দিনী, এদেশে দেখলেম আপনার প্রজারা চাকরের মতো কেবলই খাটছে আর আপনি বেশ আরামে রয়েছেন। এই বড়-ছোট ভেদটা কি ভালো?'

রানী বললেন—'তা তো বুঝি। কিন্তু রাজ-আইনটা এইরকমই যখন, তখন সেটা মানাই হচ্ছে প্রজার ধর্ম। নাহলে রাজা প্রজা সম্পর্কই উঠে যায়, রাজত্বই থাকে না।'

আমি বললেম—'এতে দেখছি আপনার প্রজার খাটুনিই সার। লাভটা আপনারই।'

রানী বললেন—'এ ছাড়া আর কী হতে পারে। রাজা, রাজত্ব, রাজতন্ত্র সবই যখন আমি, তখন প্রজারা আমাকে না রাখলে এর একটাও পাবে না। অন্য দেশে কেমন জানি নে কিন্তু আমার রাজত্বের ব্যবস্থা আর আইন দুয়ের দ্বারাই সবাই দেখ সুখে রয়েছে। মৌমাছিদের একটা রানী থাকার সুবিধে—আর পিঁপড়েদের দেখ রানী নেই, হাজার আমীর—তাদের যেমন খুশি চালাচ্ছে।

আমি রানীকে রাজা প্রজা উঁচু নিচু থাকার অসুবিধেগুলো কী তাই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করামাত্র রানী বললেন—'তবে এখন বিদায়, প্রজাপতি আপনাকে শুভবুদ্ধি দিন, সত্যের আলো পাঠান সবার জন্যে।' আমি তাড়াতাড়ি শুধোলেম—'আচ্ছা এত মধু চাকে জমা করে আপনাদের কী লাভটা হচ্ছে? কোনোদিন এ মধু তো আপনাদের কারু কাজে আসবে না। মানুষ একদিন তো চাক ভেঙে

সবই লুঠ করে নিয়ে যাবে—হুলও মানবে না, কামড়ও গ্রাহ্য করবে না। এটা তো আপনার প্রজাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত রানী হয়ে।'

রানী রেগে বললেন—'চুপ! চুপ! এসব শুনলে প্রজাদের মাথা বিগড়ে যেতে পারে।' বলেই রানী বোঁ করে উড়ে পালালেন।

আমি থতমত খেয়ে মাথা চুলকে চলে যাব, এমন সময় আমার মাথা থেকে একটা উকুন লাফিয়ে পড়ে আমায় নমস্কার করে বললে—'মশায়, আমি এক নেকড়ে বাঘের পিঠে চড়ে এখানে হাজির হয়েছি। এতক্ষণ আপনার কানের কাছে বসে আপনার মাথা থেকে যেসব উপদেশপূর্ণ কথা বেরিয়ে রানীকে চমকে দিয়েছে সেগুলো হজম করবার চেষ্টা করছিলেম। আপনার মনোমত রাজ্য আর সমাজ যদি কোথাও দেখতে চান তো পূর্বস্থলীতে চলুন। আপনি দেখবেন নেকড়ে বাঘের রাজতন্ত্র ঠিক আপনার কল্পনার সঙ্গে মিলে যাবে। নেকড়ে-বাঘ পায়ে পায়ে যায় সত্যি কিন্তু এ পর্যন্ত তারা পাখি খেতে শেখেনি। কাজেই সে দেশে যাওয়াতে আপনার কোনো বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা নেই। উল্‌টে বরং তারা আপনাকে খাতির করে আপনাকে মাথায় রাখতেও প্রস্তুত। সুতরাং কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে আজই সেখানে রওনা হোন।' এই বলে উকুন সরে পড়ল।

সংসারটা ছারখারে যাওয়াতে আমি যতটা না মর্মাহত হয়েছিলাম, জেন্তু-সভা নতুন সংসার পাতবার সাহায্য না করতে তার চতুর্গুণ বেদনা বাজল আমাকে। কাজেই আমি সব ছেড়ে মাছিক সাহিত্য-জগতে কিছু দান করে যাবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হয়ে বেনু-বনে বাসা নিয়েছি।

মৌচাকপুরে রাজকন্যার বিয়েতে যেদিন তুবড়ি ফুলঝুড়ি পোড়ে, সেদিন আমি একটা গান বেঁধে বরকন্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেম। সুর ও কথা দুইই নিজের কল্পিত। কোনো বাবুই এর পূর্বে এটা রচনা করেন নি। আপনারা না বিশ্বাস করতে পারেন, মৌচাকপুরে একটা লতাকুঞ্জে বসে ছোট একটা ফুলঝুরির আলো জ্বেলে, সেটা নেভবার পূর্বেই রচনা সাঙ্গ করেছিলেম। এবং মৌচাকপুরের তরুণ

সাহিত্যিকের দলে এই রচনা বেশ একটু ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়েছিল। এবং ভিতরে ভিতরে 'বোলতাই' কাগজে গোপনে সমালোচনা ছাপিয়ে আমাকে অপদস্থ করবারও চেষ্টায় ত্রুটি করেনি।

কিন্তু আমাদের পূর্বপরিচিত মধু্ মোদক খুশি হয়ে এক ভাঁড় মধু অমনি পাঠিয়ে দিয়েছে, কলাপাতার মোড়কে নিজের একটি কবিতার সঙ্গে। কবিতাটা দেখি আমা থেকেই চুরি। কাজেই এটা আমার নামেই ছাপালেম।

সুর মৌ মল্লার

বাজির ধুমেধামে
বাদর ঝরে না।
মরমর চাতকে
রাখে পিয়াসী
বারহ মাস-ই।
তুবড়ি ফুলে ভরি
আনেনা মধু,
জানে তা মধুপাই মৌমাছি—
বাদলা পোকারাই
বলে উড়ে উড়ে—
মধুমাস এল কাছাকাছি!
চলে যায় হাউই
আঁকতে বাঁকতে
সাপের মাথার মণি কাড়তে
লুকোনো মানিক তারকা-পুরে
থাকেই লুকোনো—
হাউই ফেরে শুধু
মুখটা পুড়োনো।

বলছে চর্‌কি—

.ঘুরবে মস্ত

ভূমণ্ডলএ উদয় অস্ত !

জাঁতাটা ঘুরিয়েই

হয় সে কুপোকাৎ,

একটি পা-ও চলে না—

(কোরস) নানানা—নানানা—তানানা !

ভুঁই পটোকা

বাজাতে মৃদং

মাটিতে মাথা ঠুকছে হরদম্‌ !

মৃদঙ্গের কিছুই বাজছে না—

(কোরস) নানানা—তানানা—নানানা !

দোদমা চাইলে

পেটাবো দামামা—

সুরে বলতেই

সারে-গা-ধাপামা—

নিজেই ফেটে

হয় চৌচির !

করে কান বধির—

জ্ঞান বাহির।

---

* এই গানের স্বরলিপি দিবার প্রয়োজন দেখি না। কেননা গানের সুর ও কথা এমন নিপুণভাবে রচিত যে, সকল কণ্ঠেই ইহা সকল প্রকার সুরে বেসুরে গাহিয়া গেলেও শ্রুতিকটু ঠেকিবে না !